শুকতারা
প্রথম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
১৩৫৫
ফাল্গুন
ব সাহিত্য কুটীর - কলিকাতা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান - অপ্টিমাস প্রাইম
এডিট - অপ্টিমাস প্রাইম

যোগাযোগ

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

১৩৫৪ সন, ফাল্গুন

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন

কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা—।৵০ ; সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

শ্রীপঞ্চমী
ফাল্গুন, ১৩৫৪ সাল

মুদ্রাকর
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

আমাদের কথা

বাংলার ছেলেমেয়েরা !—

একখানি মাসিকপত্র বার করবার জন্য তোমরা আমাদের অনুরোধ করে আসছিলে অনেক দিন যাবৎ; কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তোমাদের সে অনুরোধ রাখতে পারিনি এতদিন। দেশ এখন স্বাধীন—বিদেশী শাসনের অবসান হয়ে গেছে, এমনি শুভ সময়ে তোমাদের সেই অনুরোধ আমাদের মনের কোণে যেন আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে! কাজেই এই "শুকতারা"র উদয়।

তোমরা কত জনা এরই মাঝে অযাচিত ভাবে "শুকতারার" এক বছরের দাম ৪৲ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়ে বসে আছ! আর তোমাদেরই বোধহয় প্রায় চার হাজারটি ছেলেমেয়ে "শুকতারা" পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের কাছে তোমাদের নাম-ঠিকানা লিখিয়ে রেখেছ। এতেই আমরা বুঝতে পারছি কী তোমাদের উৎসাহ, আর কত যে তোমাদের আগ্রহ!

তোমাদের এই উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে আমরাও বুকের ভেতর গৌরব বোধ করছি; কিন্তু সেই সঙ্গে ভয় হচ্ছে, আমাদের আয়োজন তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছে অপ্রচুর বলে মনে না হয়!

"শুকতারা"য় অনেক-কিছুই আমরা দেবার আশা রাখি; কিন্তু ছোট্ট মাসিকপত্র; পড়তে সুবিধা হবে বলে তারও বেশীর ভাগ ছাপা হলো কিছু বড় অক্ষরে। কাজেই সব রকম জিনিষ একই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবু আশা করি, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হবে আমাদের প্রধান সম্পদ্।

"শুকতারা" সম্বন্ধে তোমাদেরও যদি কিছু বলবার থাকে, আরো কিছু জিনিষ যদি তোমরা চাও, তা হলে অকপটে সব আমাদের লিখে জানিও। আমরা তা সাদরে গ্রহণ করে, চিন্তা করবো। মোটকথা, "শুকতারা" তোমাদেরই কাগজ—তোমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাই

আমরা এতে ফুটিয়ে তুলতে চাই। কাজেই তোমরা আমাদের সাহায্য করো, এই অনুরোধ।

এখন একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে জাগতে পারে, তোমাদের 'শুকতারায়' কোন সম্পাদকের নাম নেই কেন? তার কারণ, কোন একটি বিশেষ লোকের হাতে এর সম্পাদনার ভার নেই। মৌমাছি যেমন সব ফুল হতে মধু আহরণ করে তার মৌচাককে করে তোলে সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের বড় বড় সমস্ত শিশু-সাহিত্যিকের সাহায্য নিয়ে তোমাদের "শুকতারা"ও হয়ে উঠবে সুন্দর। যে সব সাহিত্যিক আজন্মকাল তোমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরা সকলেই তোমাদের 'শুকতারার' গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছেন; যেমন, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীসরোজ রায় চৌধুরী, যাদুকর পি. সি. সরকার, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি। এ ছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁদের পরিচয় তোমরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়েই 'শুকতারায়' পাবে।

"শুকতারা" প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহেই বার হবে। গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি মাসের দশ তারিখের মধ্যে তার কাগজ না পাও, তা হলে আমাদের লিখো। বেশী দেরী হলে ডাকঘরে খোঁজ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এখনো যারা "শুকতারা"র গ্রাহক হওনি, আশা করি এইবার তারা বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা পাঠিয়ে এক বছরের জন্য নিশ্চিন্তভাবে গ্রাহক হয়ে থাকবে।

আমরা তোমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দ কামনা করি। জয় হিন্দ!

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৪
কলিকাতা
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ
পরিচালক,
দেব সাহিত্য-কুটীর

শুকতারা

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শুকতারা (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর	১
২।	প্রশান্তের আগ্নেয়-দ্বীপ (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩
৩।	পুব-আকাশের দুয়ার খোলে কে ? (বিজ্ঞান)	"শ্রীবৈজ্ঞানিক"	৮
৪।	লঙ্কা-দহন (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	১৩
৫।	সাধনায় পাষাণ কথা কয় (বৈদেশিকী) ···	শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত	১৮
৬।	আলো-ছায়ার খেলা (আলোক-চিত্র)	শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে	২৩
৭।	ভিড় করো না কেউ (স্বাস্থ্য-চর্চ্চা)	শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ	২৪
৮।	আবাহন (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৩০
৯।	সেবক (গল্প)	শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া	৩১
১০।	হীরে-জহরৎ (বিশ্ব-বৈচিত্র্য)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৮
১১।	একটা কিছু লেখো (প্রতিযোগিতা)		৪১
১২।	গাহ ভারতের জয় (কবিতা)	শ্রীগৌরী দেবী	৪২
১৩।	মহাত্মা গান্ধী	শ্রীদীপক	৪৩
১৪।	ওরা কেমন করে বাঁচে ? (জীবজন্তু)	কুমারী রূপা ব্যানার্জ্জি	৪৮
১৫।	ধাঁধাঁ		৫২
	সম্পাদকীয়		

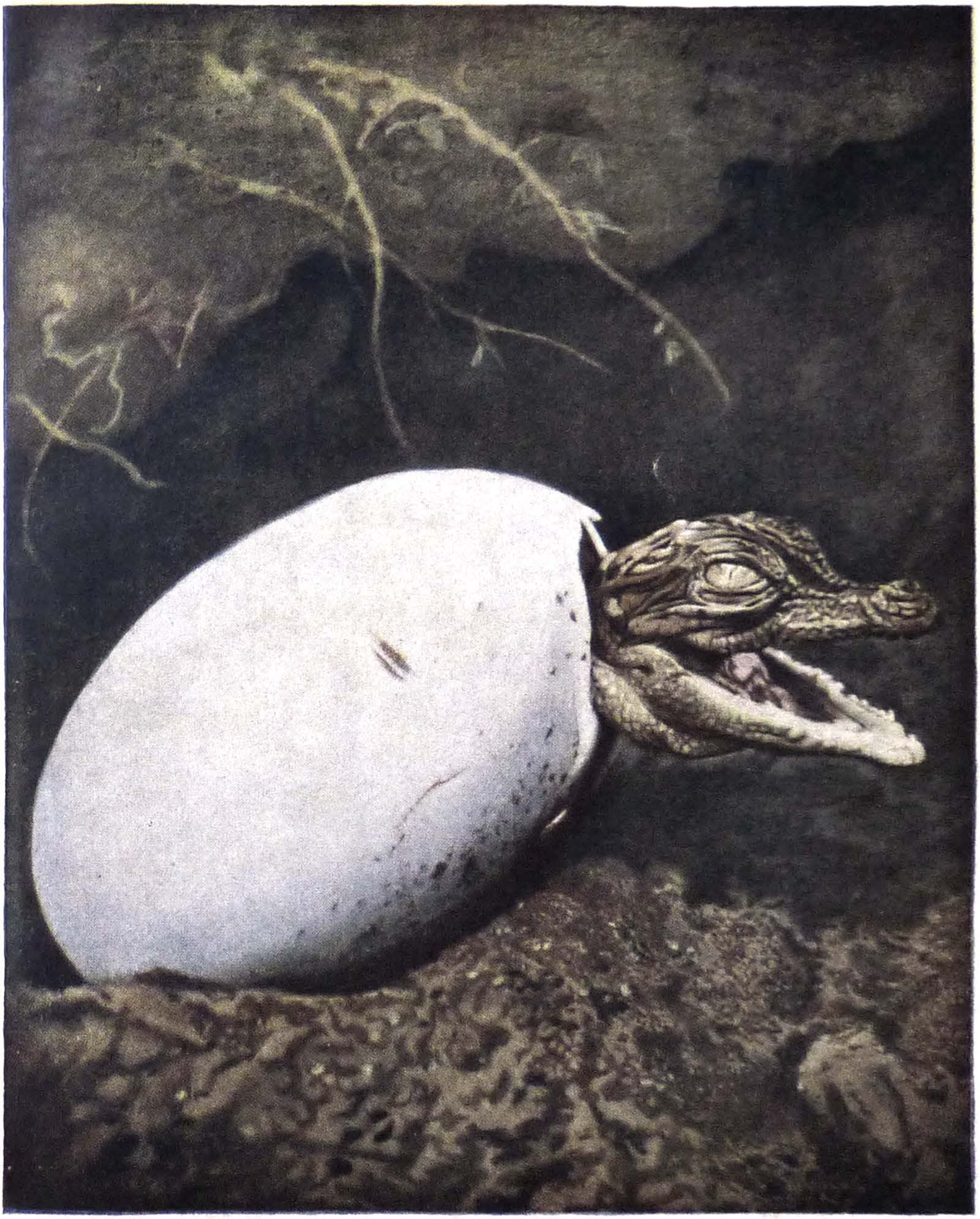

"বাঃ রে পৃথিবী !"

শুকতারা

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

শুকতারা, তুমি যখনি উদিলে, জানি
অরুণ উদিতে নাহি বেশি আর দেরী ;
বনে বনে তার শুনি আগমনী বাণী
প্রভায় তোমার রথকেতু তার হেরি।

কুলায়ে কুলায়ে জাগিয়া ভোরের পাখী
ভোর না হতেই ভোরের খবর রাখে ;
তুমিই তাদের কানে কানে কও ডাকি,
"আসিছে অরুণ, আর কি ঘুমায়ে থাকে ?"

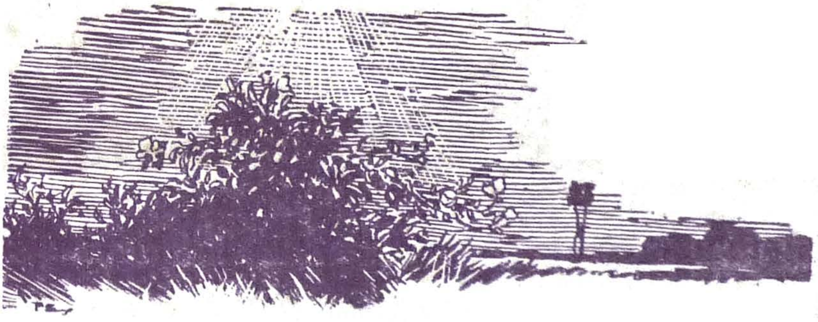

তড়াগে কাননে প্রান্তরে ফুল-কলি
ফুটি-কি-না-ফুটি ভাবে যারা দ্বিধাভরে,
দূত করি' তুমি পাঠাইলে যত অলি,
গুঞ্জনে তারা সব সংশয় হরে।

দেশের মুক্তি এসেছে সবাই বলে,
আমি বলি শুধু সূচনা হয়েছে তার,
তারই শুকতারা জেগেছে গগনতলে,
আসিতে লগন বেশি দেরী নাই আর।

এখনো তিমির পশেনি অন্ধকূপে,
এখনো ধরায় জাগেনি সর্ব্বভূত,
পূর্ণ মুক্তি আসিবে অরুণরূপে
শুকতারা, তুমি তাহারি অগ্রদূত।

প্রশান্তের আগ্নেয়-দ্বীপ

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিমল ও কুমার তো তোমাদের অনেকদিনের বন্ধু ; কিন্তু তোমরা বোধ হয় এটা জানো না, তারা দু'জনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এক তিথিতে এবং একই দিনে।

আজ মাসের পয়লা। এই মাসের আটাশ তারিখে তাদের দু'জনের জন্মতিথি। তাদের প্রত্যেক জন্মতিথিতেই বিশেষ একটি অনুষ্ঠান হয়। এবারকার উৎসবে কি করা কর্ত্তব্য, সেদিন সকালের চায়ের আসরে বসে গভীরভাবে চল্‌ছিল তারই আলোচনা।

জয়ন্ত এবং মাণিক বোধ হয় তোমাদের কাছে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তারা বিমলদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, সেদিনও এসেছিল। আর সুন্দরবাবুর কথা তো বলাই বাহুল্য ; কারণ, এখানকার প্রভাতী চায়ের বৈঠকে কোন দিনই তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায় না। সুতরাং বলতে হবে আজকের চায়ের আসরটি জমে উঠেছিল রীতিমত।

এমন কি বাঘা কুকুরও হাজিরা দিতে ভোলেনি। সেও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে দুই কান তুলে ঊর্দ্ধমুখে অত্যন্ত উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ছিল চায়ের

টেবিলের দিকে। সে বেশ জানে, টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা-সেটা কিছু-কিছু অংশ তারও দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

মাঝে মাঝে রামহরি খাবারের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে ঢুকে সকলকে পরিবেষণ করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু একখানা গোটা স্যাণ্ডউইচ্ নিজের মস্ত মুখ-বিবরে ছেড়ে দিয়ে চর্ব্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "বিমল ভায়া, তোমাদের প্রতি জন্মতিথিতেই তো আমরা এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে যাই; কিন্তু এবারকার খাদ্য-তালিকার ভিতরে আমার একটি বিনীত প্রার্থনা ঠাঁই পাবে কি?"

সুন্দরবাবুকে জ্বালাবার কোন সুযোগই মাণিক ত্যাগ করে না। সে বললে, "আপনার বিনীত প্রার্থনাটি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ? হয়তো বলে বসবেন, আমি কাঁঠালের আম-সত্ব খাবো!"

সুন্দরবাবু স-টাক মাথা নেড়ে বললেন, "না কক্খনো নয়, অমন অসম্ভব আবদার আমি করবো না। ফাজিল ছোকরা কোথাকার, আমায় কি কচি খোকা পেয়েছ?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের জন্মদিন আসতে না আসতেই চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ তোলা কেন? মাণিকবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে আর বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না, ওঁর যা বলবার আছে উনি বলুন।"

সুন্দরবাবু মাণিকের দুষ্টুমি-ভরা হাসির দিকে একবার সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে বললেন, "আমার কথাটা কি জানেন কুমারবাবু? এবারে আপনাদের জন্মতিথির খাদ্য-তালিকায় কিঞ্চিৎ নূতনত্ব সৃষ্টি করলে কেমন হয়?"

—"কি রকম নূতনত্ব সুন্দরবাবু?"

—"দেখুন কুমারবাবু, চিরদিনই শুনে আসছি বন-মুর্গীর মাংস নাকি একটি অতি উপাদেয় খাদ্য; কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত আমার খাবারের থালায় বন-মুর্গীর আবির্ভাব হোলো না কখনো। আপনাদের জন্মতিথির দৌলতে যদি সেই সৌভাগ্যটা লাভ করতে পারি, তা হলে আমার একটি অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ হয়।"

মাণিক বললে, "দেখছো তো জয়ন্ত, সুন্দরবাবুর আবদারটি কতদূর অসঙ্গত!"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন, "কেন, অসঙ্গত কেন? আমি কি কাঁঠালের আম-সত্ব খেতে চাইছি? বন-মুর্গী কি দুনিয়ায় পাওয়া যায় না?"

মাণিক বললে, "দুনিয়ায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু কলকাতার সহরে পাওয়া যায় না। আপনার বন-মুর্গীর জন্যে বিমলবাবুরা বনবাস করবেন নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "অভাবে কলকাতার ফাউল হলে কি চলবে না? সুন্দরবাবু কি বলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই। আর্জ্জি পেশ করলুম এখন বিমলবাবুদের যা মর্জ্জি হয়।"

কুমার চোঁ করে শেষ চাটুকু পান করে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "তথাস্তু, সুন্দরবাবু, তথাস্তু! আমাদের আসছে জন্মবারে আপনাকে বন-মুর্গীর মাংস খাওয়াবোই, খাওয়াবো!"

বিমল একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "কুমার, তুমি যে একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলে হে! কলকাতার কোনো বাজারে বন-মুর্গী বিক্রি হয় নাকি?"

কুমার বললে, "মোটেই না!"

—"তবে?"

—"আমার বন্ধু বিনোদলাল রায় চৌধুরী হচ্ছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার। তিনি প্রায়ই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। তুমি জানো বোধ হয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনে ঝাঁকে ঝাঁকে বন-মুর্গী পাওয়া যায়! মনে করছি, কালই আমি দিন-কয়েকের জন্য চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।"

মাণিক বললে "সে কি কুমারবাবু, সুন্দরবাবুর একটা আবদার রক্ষা করবার জন্যে আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করবেন?"

—"না মাণিকবাবু, কেবল সুন্দরবাবু কেন, আমি আপনাদের সকলেরই তৃপ্তি সাধনের জন্যে চট্টগ্রামে যেতে চাই। জন্মতিথিতে বন্ধুদের যদি একটি নতুন জিনিস খাওয়াতে না পারি, তা হলে জন্মতিথির আর সার্থকতা রইল কোথায়? আমি কালই চট্টগ্রামের দিকে ধাবমান হবো। তারপর সেখানকার বন থেকে ডজন-খানেক জাত্ বন-মুর্গী সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসবো আমাদের কলকাতায়।"

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার 'বিনীত প্রার্থনা' তা হলে পূর্ণ হোলো। এইবারে আপনি পরমানন্দে অট্টহাস্য করতে পারেন।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে কেবল বললেন, "হুম্।"

* * * * *

চট্টগ্রাম থেকে কুমারের ফেরবার কথা ছিল বিশ তারিখে।

কিন্তু ঠিক তার আগের দিনে কুমারের কাছ থেকে বিমল এই টেলিগ্রাম পেলে, "বন-মুর্গী পেয়েছি; কিন্তু আসছে কাল কলকাতায় পৌঁছুতে পারব না। বিশেষ কারণে আমাকে আরো দিন-কয়েক এখানে থেকে যেতে হবে। এ জন্যে যদি আমাদের জন্মতিথি-উৎসব মাটি হয়, উপায় নেই।"

টেলিগ্রামখানি হাতে করে বিমল বিস্মিত মনে ভাবতে লাগল, কুমারের বিশেষ কারণটা কী হতে পারে? নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ কারণ নয় যার জন্যে বন-মুর্গী পেয়েও সে যথাসময়ে এখানে আসতে নারাজ!

তেইশ তারিখে কুমারের আর একখানা টেলিগ্রাম এলো। সেখানি পড়ে বিমল জানতে পারলে, চব্বিশে তারিখের সকালে সে কলকাতা এসে পেঁছবে।

কুমার একটি রীতিমত রহস্যপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল। সেই জন্য বৈঠকখানায় তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল বিমল, জয়ন্ত ও মাণিক।

খানিক পরে রাস্তায় দরজার কাছে একখানা গাড়ি আসবার শব্দ হোলো। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে কুমার। জয়ন্ত বললে, "কুমারবাবু, আপনার টেলিগ্রামে যা দেখেছি, আপনার মুখেও দেখছি তাই।"

—"আমার মুখে কি দেখছেন জয়ন্ত বাবু?"

—"রহস্যের আভাস।"

হাতের বন্দুকটা একটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কুমার বললে, "হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আপনি ভুল দেখেন নি। যা-তা রহস্য নয়—যাকে বলে একেবারে গভীর রহস্য; কিন্তু সে কথা পরে বলছি, আগে বন-মুর্গীগুলোর একটা ব্যবস্থা করি।……রামহরি, ও রামহরি!"

পাশের ঘর থেকে সাড়া এলো, "কি বলছো গো কুমারবাবু?"

—"গাড়ির চালে এক ঝাঁকা জ্যান্ত রাম-পাখি আছে। তুমি সেগুলোকে বাগানে মুর্গী-ঘরে রেখে এসো। তারপর তাড়াতাড়ি আমার জন্যে খুব গরম এক পেয়ালা চা বানিয়ে দাও।"

কুমার নিজের কোটটা খুলে একখানা সোফার উপরে নিক্ষেপ করলে। তারপর নিজেও সেখানে বসে পড়ে বললে, "বিমল, অদ্ভুত ব্যাপার—একেবারে অভাবিত!"

বিমল বললে, "তোমার মুখ থেকে শুনছি বলেই ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে বিশ্বাস করছি। পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে সব ব্যাপারকে অদ্ভুত বলে মনে করে, তার মধ্যে আমি কিছু মাত্র অদ্ভুতত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু তোমার-আমার কথা স্বতন্ত্র। এই জীবনেই আমরা এমন সব অসাধারণ ব্যাপার দেখেছি যে, আমাদের কাছে বোধহয় অদ্ভুত বলে আর কিছুই থাকতে পারে না। কাজেই তুমি যা অদ্ভুত আর অভাবিত বলে বর্ণনা করবে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে দস্তুরমত অসাধারণত্ব আছে। আমরা প্রস্তুত, আরম্ভ করো তোমার অদ্ভুত কাহিনী।"

বিমল সোফার উপর একটু সোজা হয়ে বসলো। গল্প শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বিশাল হলঘর একেবারে নিস্তব্ধ!

(ক্রমশঃ)

আমাদিগকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রতিপক্ষের এক বিন্দু রক্তেও যেন আমাদের হাত কলুষিত না হয়, কখনও যেন আমরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করি।

পূব-আকাশের দুয়ার খোলে কে?

—"শ্রীবৈজ্ঞানিক"

যখন পৃথিবীর সকলেই থাকে ঘুমে অচেতন, আর সর্ব্বত্র দেখা যায় একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব, তখন পূব-আকাশের দুয়ার খুলে দেখা দেয় একটি তারা! সে যেন তার স্নিগ্ধ রুপালী আলো ছড়িয়ে প্রচার করে নূতন দিনের আগমনী, নিদ্রামগ্ন জীব-কুলের কানে পৌঁছে দেয় নব-জাগরণের আহ্বান! এই তারাটিকে বলে 'শুকতারা'।

আচ্ছা, শুকতারা কি কেবল ভোরের দিকেই ওঠে?—না, তা নয়। অনেক সময় এই একই তারা সন্ধ্যের সময়ও দেখা যায়; কিন্তু তখন তাকে বলে 'সন্ধ্যা-তারা' বা 'সাঁঝের তারা'। তবে একই রাত্রে 'সাঁঝের তারা' আর 'শুকতারা' দুইই দেখা যায় না। কারণ, বছরের যে-সময়ে সাঁঝের তারা ওঠে, সে-সময় আর সে শুকতারা-হিসেবে দেখা দেয় না; আবার শুকতারা-হিসেবে যখন দেখা দেয়, তখন আর সাঁঝের তারা দেখা যায় না। কাজেই 'শুকতারা' বলতে শুধু ভোরের তারাকেই বুঝায়—সে যেন ভোরের আলোর অগ্রদূত!

এই প্রভাতী তারাটির নাম শুকতারা হলো কেন, জান? 'শুক্রতারা' থেকে এর নাম হয়েছে 'শুকতারা'; অর্থাৎ ভাল কথায় শুকতারাকেই বলে 'শুক্র'!

তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, আকাশের ঐ উজ্জ্বল সূর্য্যটা এক সময় খুবই বড় ছিল। তারপর সেই বিশাল সূর্য্যের দেহ থেকে কতকগুলি ছোট-বড় জিনিস ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়ে ওরই চার-ধারে ঘুরতে আরম্ভ করে। সেই জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় নয়টিকে বলে 'গ্রহ'। আবার ঐ গ্রহগুলির দেহ থেকেও কতকগুলি টুকরো খসে গিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করে। তাদের নাম হলো

'উপগ্রহ'। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম : সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে তার গ্রহ আর উপগ্রহগুলি,—যেন বাড়ীর বুড়ো কর্ত্তার চার দিকে তাঁর ছেলে-মেয়ে আর নাতি-নাৎনীরা ঘোরাফিরা করছে !

এখন এই যে নয়টি গ্রহের কথা বলা হলো—এদেরই একটির নাম 'শুক্র'। অন্যান্য গ্রহের মত শুক্রও মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে, তার নির্দ্দিষ্ট পথে ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় সে আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে ; কিন্তু সে কাছে-আসার মানে কি জান ? তার মানে, তখনো পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব থাকে আড়াই কোটি মাইল !

বেশি নয়, মাত্র আড়াই কোটি মাইল ! কথাটা খুবই হাসির মনে হবে। হয়তো বলবে, আড়াই কোটি মাইল—সে কি কম দূর ? কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের রাজ্যে আড়াই কোটি মাইল সত্যই অতি সামান্য। কারণ, আমাদের মাথার উপরের ঐ আকাশটা একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জিনিস। সে এত প্রকাণ্ড ও এত বিপুল যে, লক্ষ-কোটি মাইলও তার হিসেবে কিছুই নয় !—কাজেই গ্রহ-নক্ষত্রের রাজ্যে আড়াই কোটি মাইল যেন—নেহাৎ এ-পাড়া আর ও-পাড়া !

যা হোক,—শুক্র মাঝে মাঝে এই রকম কাছে আসায় আমরা তার অনেক খবর জানতে পেরেছি। শক্তিশালী দূরবীণ চোখে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা তার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করেছেন। তার ফলে তার ঐ হীরের মত জ্বল্‌জ্বলে চেহারার বদলে তার সত্যিকার রূপটি ধরা পড়ে গেছে।

দূরবীণের চোখ বড় সাফ। তার কাছে ফাঁকি দেবার জো নেই। সেই দূরবীণের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শুক্র আমাদের এই চির-পরিচিত মাটির পৃথিবীর মতই একটা সাধারণ জিনিস, তবে আকারে তার চেয়ে একটু ছোট। সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর লাগে বারো মাস, কিন্তু শুক্রের পথটা ছোট, তার লাগে সাড়ে সাত মাস ; অর্থাৎ পৃথিবীতে বৎসর হয় বারো মাসে আর শুক্রে বৎসর হয় মাত্র সাড়ে সাত মাসে !

আর একটা মজার কথা এই যে, শুক্রে দিন-রাত্রি নেই। পৃথিবী তার মেরু-দণ্ডের উপরে এমন ভাবে ঘোরে যে, তার ফলে রাতের পরে দিন এবং দিনের পরে

রাত দেখা দেয়। কিন্তু শুক্র সে ভাবে ঘোরে না। তার একটা দিক্ সে চিরকালের জন্য সূর্য্যের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে ; অপর দিক্‌টা চিরকালের জন্যই 'অসূর্য্যম্পশ্যা', অর্থাৎ সূর্য্য কখনো তাকে দেখতে পায় না, কাজেই সেদিকে চিরকালই অন্ধকার! এর ফলে এক দিকে চিরকালই দিন, আর এক দিকে চিরকালই রাত্রি।

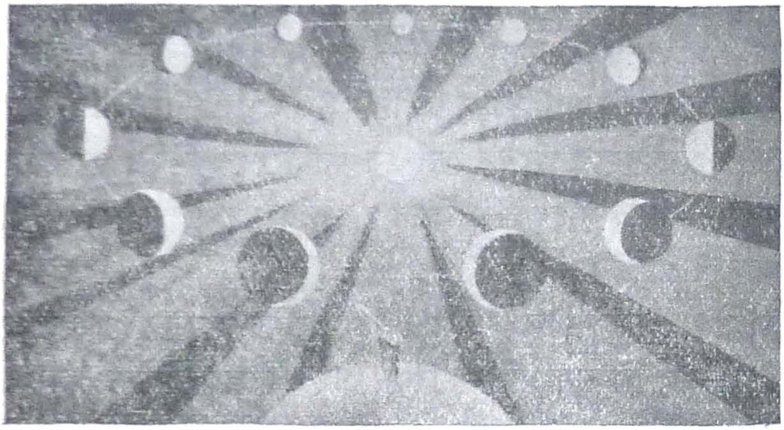

চন্দ্র-কলার মত শুক্র-কলারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

তোমরা দেখেছ, অমাবস্যার পর থেকে আমাদের চাঁদ রোজই একটু করে বড় হতে থাকে, আর পূর্ণিমার পর থেকে রোজই একটু করে ক্ষয়ে যায়। চন্দ্রের যেমন অংশ বা 'কলা' আছে, শুক্রেরও তেমনি কলা আছে। চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধির মত শুক্র-কলারও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তবে চন্দ্র-কলার ক্ষয় ও বৃদ্ধি চোখে দেখা যায়, কিন্তু শুক্র-কলার তা খালি চোখে দেখা যায় না,—এই যা পার্থক্য!

তোমরা হয়তো জান, চাঁদের নিজের আলো নেই, সূর্য্যের আলো ধার করেই সে নিজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং আকাশেও আলো ছড়ায়। কিন্তু এই রকম পরের ধনে পোদ্দারি শুধু চাঁদই করে না, সব-কয়টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহের দলও এই দোষে দোষী! কাজেই শুক্র বা আমাদের শুকতারাও বাদ যায় না; কিন্তু এর আলো অন্যান্য গ্রহের আলোর চেয়ে কিছু বেশি বলে মনে হয়। এর কারণ কি, বলছি।—

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন সাদা জিনিসের উপরে সূর্য্যের আলো পড়লে জিনিসটি উজ্জ্বল দেখায় খুব বেশী, আর তা থেকে আলোও ঠিকরে পড়ে অনেক বেশি। আমাদের পৃথিবীর আকাশে যেমন মাঝে মাঝে মেঘ দেখা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে, শুক্রের আকাশেও সেই রকম মেঘ আছে। পৃথিবী থেকে দেখলে শুক্রের

সেই মেঘের আবরণই আমাদের চোখে পড়ে; আর সেই মেঘের উপর রৌদ্র পড়ে বলেই শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়!

এখন, এই মেঘের কথা বলতে গেলে আরও দুটো কথা এসে পড়ে। মেঘ হয় জলীয় বাষ্প থেকে। শুক্রে যখন মেঘ আছে, তখন নিশ্চয় জলও আছে; কিন্তু সে-জল আছে কি ভাবে?

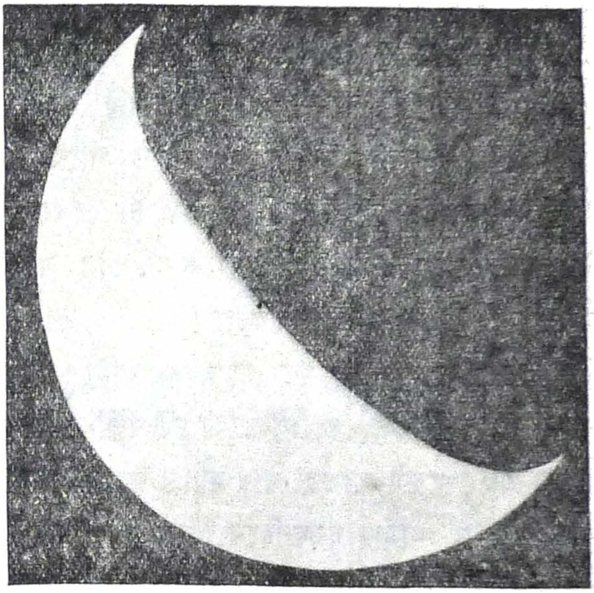

রোদ পড়ে বলেই শুক্র এত উজ্জ্বল!

এর আগে বলেছি সূর্য্যের আলো শুক্রের কেবল এক দিকেই পড়ে, তার অপর দিকে অন্ধকারের চির-রাজত্ব। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায়, যেদিকে রোদ পড়ে, সেদিক্‌টা ভয়ানক গরম, আর তার উল্টো দিকে ভয়ানক ঠাণ্ডা। তার ফলে গরম দিক্‌টার সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মেঘ হয়েছে, আর ঠাণ্ডা দিক্‌টার জল খানিকটা শুক্রের গায়েই বসে গেছে, আর বাকি সবটা জমে বরফ হয়ে আছে!

শুক্রে জল তো আছে, কিন্তু বাতাস আছে কি?—

শুক্র বা শুকতারার আকাশেও মেঘ ভেসে যায়, সে কথা বলেছি। শুক্রের আকাশে যখন মেঘ ভেসে বেড়ায়, তখন বাতাস সেখানে নিশ্চয়ই আছে। বাতাস ছাড়া তো মেঘের ভেসে বেড়ানো সম্ভব নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, শুক্রে জল আছে, বাতাস আছে, আর সূর্য্য-কিরণের জন্য উত্তাপও আছে; অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাণ-ধারণের জন্য যে তিনটি মূল জিনিসের দরকার, শুক্রে তা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তবে কি শুক্রে জীবজন্তু বা গাছপালাও আছে?

হয়তো আছে ; কিন্তু থাকলেও তা নিশ্চয়ই পৃথিবীর জীব-জন্তু বা গাছপালার মত হবে না। কারণ, শুক্র পৃথিবী নয়, পৃথিবীর সঙ্গে তার অমিলও রয়েছে অনেক ; কাজেই তার জীবজন্তু বা গাছপালা পৃথিবীর জীবজন্তু বা গাছপালার মত হতে পারে না। তবে সে সকল কি রকম ?—

হয়তো শুক্র এক অদ্ভুত সৃষ্টি ! যদি দৈববলে কখনো সেখানে গিয়ে হাজির হও, হয়তো এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যা তোমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেবে। সেখানে গিয়ে হয়তো দেখতে পাবে,—গাছপালাগুলো তাদের শিকড় দিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না, তার বদলে তারা ডালপালায় ভর দিয়ে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়ায় !

আগে বলেছি, শুক্রের গায়ের একদিকে আছে জল, আর অন্য দিকে আছে উত্তাপ। গাছকে বাঁচতে হলে, ঐ দুটি জিনিসেরই দরকার। কিন্তু সে তো আর শুক্রের এক দিকেই পাওয়া যায় না ! কাজেই গাছেরা হয়তো ঠাণ্ডা দিকে এসে জল শুষে নেয়, আবার গরম দিকে গিয়ে রোদ পোহায় !

এই রকম এক ঝাঁক গাছ যদি হঠাৎ তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তা'হলে তুমি কি যাদুকরের 'ম্যাজিক' বলে তা মনে করবে না ? হয়তো মনে হবে, 'শুক্র' বা 'শুকতারা' নিশ্চয়ই কোন যাদুপুরী !

যে সকল হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগ্নীকে আপনার করিয়া লওয়া, তাহাদিগকে আদর ও সেবার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা এবং স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম, এইরূপ মনে করা।

লঙ্কা-দহন

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

পট্‌লা, হাবুল, গণ্‌শা, ভূতো, পাড়ার ছেলের দল,
সবাই মিলে আনন্দ-চঞ্চল ;
সন্ধ্যা-বেলা "লঙ্কা-দহন" করবে অভিনয়,
তাইতো সাড়া জাগ্‌লো পাড়াময়।
সকাল থেকেই হৈ-চৈ আর হল্লা চলে জোর,
পল্লী জুড়ে চলেছে হুল্লোড় !
সবাই মিলে মঞ্চ বাঁধে, খাটায় তারা 'সিন'
খেটে-খুটে আজকে সারাদিন।
সন্ধ্যা হতেই জম্‌লো আসর, তৈরি সবাই, ব্যাস্‌,
'ড্রপ' পড়লো, জ্বল্‌লো বাতি 'গ্যাস্‌'।
হুটোপুটি, ছুটোছুটি লাগায় ছেলের দল,
উত্তেজনায় করছে কোলাহল।

কে এসে কে বস্‌বে আগে তাই সবে অস্থির,
জম্‌ছে ক্রমে গ্রামবাসীদের ভীড় !
সাত-গাঁ থেকে জুটলো সবাই দেখতে থিয়েটার,
এমন যেন হয়নি কভু আর !
রাজু মোড়ল, আজু গোঁসাই, নায়েব গজানন—
একে একে করলো আগমন।
ঠুক্‌ঠুকিয়ে বাঁশের লাঠি গাঁয়ের যত চাঁই
আসর মাঝে জুটেছে সবাই।
ক্ষান্তপিসি, আন্নাকালী যায়নি তারাও বাদ,
বৃদ্ধা হলেও, নেই কি তাদের সাধ ?
গাঁয়ের যত বৌ-ঝিয়েরাও এসে হাজির হয়
সন্ধ্যাবেলা দেখতে অভিনয়।
মোদ্দা কথা, গাঁয়ের কেহ আসতে বাকি নেই,
পুরোপুরি সন্ধ্যা না হতেই ;
বসেন এসে হেড মাষ্টার, অনন্ত ডাক্তার,
সঙ্গে আসেন অঙ্কের মাষ্টার।
নস্যি নাকে হেলে দুলে বঙ্কিম পণ্ডিত
যথাসময়ে হলেন উপস্থিত।
"লঙ্কা-দহন" পালা হবে, বিখ্যাত এই বই,
তাইতো এত লেগেছে হৈ-চৈ !
কল্‌কাতাতে এ বইখানি চলে হাজার রাত,
এক নাটকেই সারা বাজার মাৎ !
শহর থেকে আস্‌লো শিখে রাবণ রাজার 'পার্ট'
আজ্‌কে ভূতো দেখিয়ে দেবে 'আর্ট' !

শুরু হোলো "লঙ্কা-দহন" ঘন্টা পড়ে যেই,
'সিন্'টি ওঠে একটি মুহূর্ত্তেই !
দেখা গেল, রাবণ বসে' সিংহাসনের পর,
চেহারা তার বিকট, ভয়ঙ্কর !
সাম্নে তাহার পড়ে' আছে রামের হনুমান
দড়ি দিয়ে বদ্ধ তনুখান।
রাক্ষসেরা আক্রোশে সব লাগাচ্ছে লাফ-ঝাঁপ,
হুঙ্কারেতে ভয় যে লাগে, বাপ্ !
এমন সময় রাবণ রাজা চেঁচালো উৎকট—
"শোনরে হনু, শোন্ ওরে মর্কট !
অশোক-কানন লণ্ড-ভণ্ড করলি, পাবি ফল,
মোর আদেশে মোর অনুচরদল
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে লম্বা তোর ও লেজ,
চুক্‌বে ল্যাঠা, ঘুচ্‌বে ব্যাটার তেজ।"

রাবণ রাজার কথা শুনে হাসলো হনুমান,
ভেংচি কাটে বার করে' জিভ্‌খান !
তাই না দেখে রাবণ রাজা থাক্‌তে নারে আর,
গোঁফ পাকিয়ে আস্‌লো কাছে তার।
কানটি ধরে' হনুমানের চড়্ মারে চট্‌পট্।
চড়টি খেয়ে শ্রীহনু ঝট্‌পট্

বাঁধন ছিঁড়ে দাঁড়ায় সোজা মুখোস খুলে তার
বল্লে, "ভূতো, দেখাচ্ছি এইবার।
রাস্‌কেল, তুই চড় মেরেছিস্‌, কানটি ধরে' মোর,
স্পর্দ্ধা বড় দেখছি আজি তোর!"
এই না বলে' গণ্‌শা ধরে' পাক্‌ড়ে ভূতোর ঘাড়,
চালায় লাথি-গাঁট্টা যে এন্তার!
ঝাপ্‌টে ভূতো লেঙ্গি তারে মারলো অকস্মাৎ—
মুখ থুবড়ে হনু যে চীৎপাৎ!
পড়ার সময় ধাক্কা লেগে গ্যাসের বাতিটায়
ষ্টেজের উপর উল্টে সেটা যায়।
ধরলো আগুন হনুর লেজে, লাগলো কোলাহল,
উঠে দাঁড়ায় দর্শকদের দল।

দাউ দাউ দাউ ধরলো আগুন, গতিক ভালো নয়,
গাঁয়ের লোকে আর কি সেথায় রয়?
আজু গোঁসাই, রাজু মোড়ল, নায়েব গজানন
প্রাণ বাঁচাতে করলো পলায়ন।
ক্ষান্তপিসি, আন্নাকালী, সট্‌কে পড়ে সব,
"আগুন, আগুন," উঠছে কলরব।
ষ্টেজ পুড়ে যায়, সিন ছিঁড়ে যায়, আনছে কেহ জল,
বাল্‌তি করে ঢাল্‌ছে অবিরল।

অনেক করে' নিভ্‌লো আগুন, ষ্টেজ হোলো ছারখার,
গণ্‌শা-ভুতো হোলো পগার পার।
গাঁয়ের মাঝে অভিনয়টা জমলো সেদিন বেশ,
সত্যিকারের "লঙ্কা-দহন" শেষ!

সাধনায় পাষাণ কথা কয়

—শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত

অনেক দিন আগে সাইপ্রাসের তীরে এক বন্দর ছিল—নাম তার এর্কিলিয়াম্। পিগ্‌মেলিয়াম্ নামে সে বন্দরে এক বিখ্যাত শিল্পী বাস করত।

আত্মীয়-স্বজন কেউ তার ছিল না, কারো সঙ্গে সে মিশতোও না। দিনরাত সে তার যন্ত্র নিয়ে পাথরের ওপর কত মূর্ত্তি খোদাই করে যেতো!

শুধু এই কাজেই ছিল তার আনন্দ। সৃজনের আকাঙ্ক্ষায় মাতোয়ারা হয়ে, পাথর কুঁদে যে সকল মূর্ত্তি সে সৃষ্টি করে যেতো, তাদের সঙ্গেই ছিল তার একমাত্র সম্বন্ধ। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, দিনরাত তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই তার বুকে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেতো! এমনি ছিল শিল্প পিগ্‌মেলিয়াম্, আর এমনিধারা ছিল তার দৈনিক জীবনযাত্রার গতি!

দিন যায়, মাস যায়, এমনি ভাবে বছরও চলে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পিগ্‌মেলিয়াম্ তার নিজের সৃষ্ট মূর্ত্তির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে, আর সৃষ্টি করে যায় অসংখ্য। তারই হাতে-গড়া দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রায় প্রতি সহরে, প্রত্যেকটি মন্দিরেই বিরাজ করত। নরনারীর হৃদয়ের অর্ঘ্য যখন পূজার অঞ্জলি-রূপে সেই সব দেব-দেবীর পায়ে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌তো, পিগ্‌মেলিয়াম্ কখনো তা দেখে, কখনো বা তা উপলব্ধি করে ভক্তি ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে যেতো!

একদিন পিগ্‌মেলিয়ামের খেয়াল হলো, সে এবার দেবী নয়, মানবী-মূর্ত্তি গড়বে। ধব্‌ধবে শ্বেত পাথরের ওপর নারী-মূর্ত্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার,—না জানি কত সুষমা কত মাধুর্য্যই তার হবে!

সৃষ্টির কল্পনায় আনন্দে বিভোর হয়ে সে তার কাজ সুরু করে দিল। তারপর একদিন যখন তা সম্পূর্ণ হয়ে গেলো, তখন একটি শ্বেত-বর্ণা নারী যেন বিশ্বের সমস্ত সুষমা নিয়ে তার সুমুখে এসে আবির্ভূত হলো!

এই মূর্ত্তির এক হাত ছিল সম্মুখের দিকে প্রসারিত, আর সেই হাতে ছিল সৌরভহীন এক গোলাপ। তার অধরে অস্ফুট হাসি, আর দৃষ্টিহীন অপলক চোখে অপূর্ব্ব আকর্ষণ!

নীরব সঙ্গিনী কোন কথাই বলে না!

পিগ্‌মেলিয়াম্ তার দিকে অনিমেষ চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, দেখতে লাগলো বিভোর হয়ে। ক্রমশঃ তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য পিগ্‌মেলিয়াম্ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে কত কথাই তাকে জিজ্ঞেস্ করলো, কিন্তু তার নীরব সঙ্গিনী কোন কথাই বলে না!

ব্যথা ও বেদনায় পিগ্‌মেলিয়াম্ চঞ্চল হয়ে উঠলো। অবশেষে একদিন সইতে না পেরে, মনের চঞ্চলতা দূর করবার জন্য সে বনে বেরুলো শিকার করতে। কিন্তু শিকারে গিয়েও সে তার মন ঠিক রাখতে পারলে না—

কেবলই তার মনে হতে লাগলো বুঝি বা কেউ তার মূর্ত্তিটিকে চুরি করে নিয়ে যায় !

শিকারে তার মন বসলো না, তাড়াতাড়ি সে ছুটে এলো বাড়ীতে। সারা পথ কেবলই তার মনে হচ্ছিল, মূর্ত্তিটিকে কেউ যদি চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে। বাড়ী ফিরে সে যদি আর তাকে দেখতে না পায় !

যা হোক্, ভয় তার ভেঙে গেলো তখনই যখন সে দেখতে পেলো,—নাঃ, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে যায়নি, ঠিক তেমনি ভাবেই সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে সুমুখের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে !

দিন তার কেটে যেতে লাগলো। মূর্ত্তির সঙ্গে কথা বলবার জন্য পিগ্‌মেলিয়াম্ তখন পাগল ! এমন সৌন্দর্য্য ও সুষমার আধার, মানস-প্রতিমা তার,—কিন্তু মুখে তার কথা নেই ! কিছুতেই সে কথা কয় না ! পিগ্‌মেলিয়াম্ বিষাদে মনমরা হয়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় রাস্তায় কিসের গোলমাল শোনা গেলো ! পিগ্‌মেলিয়াম্ ছুটে গেলো তাই দেখতে। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে দেখ্‌লো, একদল লোক দেবী ভেনাসের মূর্ত্তি নিয়ে রাস্তায় শোভাযাত্রা করে যায় !

সে দেশের অধিবাসীদের একটা বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভেনাসের কাছে ঐ দিন যে যা প্রার্থনা করে, তাই সে পায়। পিগ্‌মেলিয়াম্ তাড়াতাড়ি তার জামা-কাপড় বদলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো শোভাযাত্রার সঙ্গে। মনে মনে তার একমাত্র প্রার্থনা,—তারই হাতে-গড়া ঐ পাষাণ-সুন্দরী যেন প্রাণ পেয়ে ভাষায় মুখরা হয়ে ওঠে !

দেবী ভেনাসের মূর্ত্তিও পিগ্‌মেলিয়ামের আপন হাতে গড়া। লাল রেশমী পোষাকে তাকে আজ কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল ! পিগ্‌মেলিয়াম্ মুগ্ধ ভক্তের মতো দেবীর অনুসরণ করে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলো।

জনতার অপর সকলে দেবীর চরণে আপন-আপন প্রার্থনা জানিয়ে বাড়ী ফিরে গেলো। পিগ্‌মেলিয়াম্ তখন একাকী নীরব মন্দিরে নিজের বুকের কামনা জানিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

হঠাৎ সে দেখতে পেলো, বেদীর নীচে যে আগুন জ্বলছিল, দপ্ করে তা যেন মন্দিরের চূড়ার দিকে লাফিয়ে উঠলো, আর একটা কালো মেঘ বেদীটার চারপাশে চক্রাকারে কয়েকবার পরিক্রমণ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো !

পিগ্‌মেলিয়ামের মনে আশা হলো। সে ভাবলো, দেবী ভেনাস্ হয়তো তার প্রার্থনা শুনেছেন ! এ বুঝি তাঁরই কোন ইঙ্গিত !

ছুটে সে বেরিয়ে এলো মন্দির হতে, তারপর উন্মাদের মতো আত্মহারা হয়ে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে ; কিন্তু যেতে যেতে তবু তার মনে কেবলই ভয় হচ্ছিল, এ কি সম্ভব ? পাষাণ-প্রতিমা কখনো কি কথা কইতে পারে ? তা যদি না কয়, তাহলে—তাহলে—কী সে করবে ? তাহলে এই বিশাল জগৎ-সংসারে সে যে একা—একেবারে একা !

সূর্য্য তখনো পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যায়নি, এমনি সময়ে পিগ্‌মেলিয়াম্ তার বাড়ীতে প্রবেশ করলো, আর তখনই ছুটে গেলো তার মূর্ত্তির দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কই তার মূর্ত্তি ?

পিগ্‌মেলিয়ামের মাথা ঘুরে গেলো ! সর্ব্বনাশ ! এত সাধের, এত আকাঙ্ক্ষার পাষাণ-মূর্ত্তি—কই সে ? নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে কি এত দিনের এত পরিশ্রম ও সাধনা, আর পাষাণকে প্রাণবন্ত করবার জন্য দেবতার দুয়ারে যত কিছু আকুতি,—সবই তার ব্যর্থ হলো ?

পিগ্‌মেলিয়ামের যখন এম্‌নি অবস্থা, তখন সন্ধ্যায় গৃহে ফেরবার আনন্দে, পাখীর মতো মধুর কণ্ঠে কে যেন তাকে ডাকলো, "পিগ্‌মেলিয়াম্ ! পিগ্‌মেলিয়াম্ !"

চমকে শিউরে উঠে পিগ্‌মেলিয়াম্ সে দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, তারই সৃষ্ট পাষাণ-মূর্ত্তি আজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ! পাষাণের মূর্ত্তি আজ রক্ত-মাংসে সমৃদ্ধ হয়ে সজীব সুষমায় পরিণত হয়েছে !

ধীরে ধীরে সে মূর্ত্তি এগিয়ে এলো পিগ্‌মেলিয়ামের দিকে, তার পর আয়ত চোখ দুটি তার মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে বললে, "পিগ্‌মেলিয়াম্ ! দেবী ভেনাস্ আমাকে আজ প্রাণ দিয়ে গেছেন ; আর লাল রঙের যে রেশমী পোষাক ছিল তাঁর নিজের দেহে, তাই তিনি আমায় পরিয়ে দিয়ে গেছেন পিগ্‌মেলিয়াম্ !"

পিগ্‌মেলিয়াম্ তাকিয়ে দেখে, সত্যই তো! দেবীর পোষাকে তার সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে শতগুণ!

সত্যই তো! তার সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে শতগুণ!

মুগ্ধভাবে পিগমেলিয়াম্ তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলো, "তুমি কেমন করে প্রাণ পেলে বল তো!"

জীবন্ত মূর্ত্তি আবার কথা বললো, "আমি তো পাষাণই ছিলাম পিগ্‌মেলিয়াম্!

তারপর কেমন করে আমার ঘুম ভেঙে যায়! ঘুম ভাঙতেই আমার মনে হলো, আমার হাত থেকে গোলাপ ফুলটা যেন খসে পড়ে যাচ্ছে!

দেবী ভেনাস্ আমায় বলে গেছেন, 'পিগ্‌মেলিয়ামের সাধনাই তোমার পাষাণ-বুকে জীবন-ধারা বইয়ে দিয়েছে। কাজেই আজ থেকে তুমি তার, সেও তোমারি।' তিনি আমার নাম দিয়ে গেছেন 'গ্যালাটিয়া'।"

নিঃসঙ্গ শিল্পী পিগ্‌মেলিয়াম্, হঠাৎ তার এমনধারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে, তার সাধনা-লব্ধ নতুন সঙ্গিনীর হাত ধরে কখন যে অভিভূত ভাবে দেবী ভেনাসের এক চিত্রের পদতলে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে বসে পড়েছে, তা সে জানতেই পারেনি!

[মিসেস্ জি. এচ্. কুফারের লেখা অবলম্বনে।]

আলো-ছায়ার খেলা!

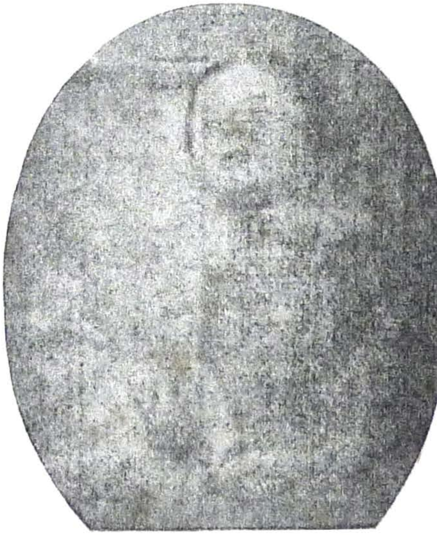

হাসি

গালভরা মুখখানি,
মনখোলা হাসি!
ধ্রুবতারা হাসে যেন
আলোকের রাশি!

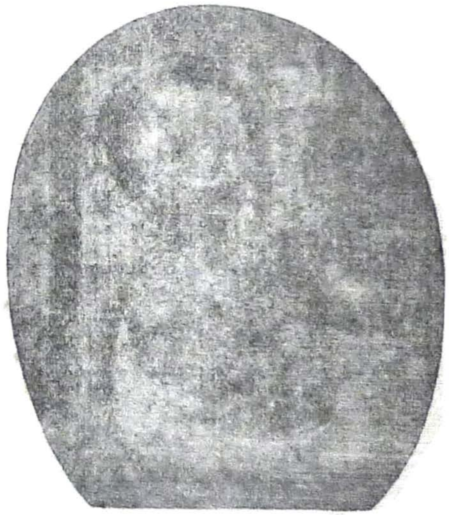

কান্না

কি বেদনা কেবা জানে
সোনা-চোখে জল!
শান্ত জলধি আজি
আহত-উতল!

আলোক-চিত্রশিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, গৌহাটী, আসাম

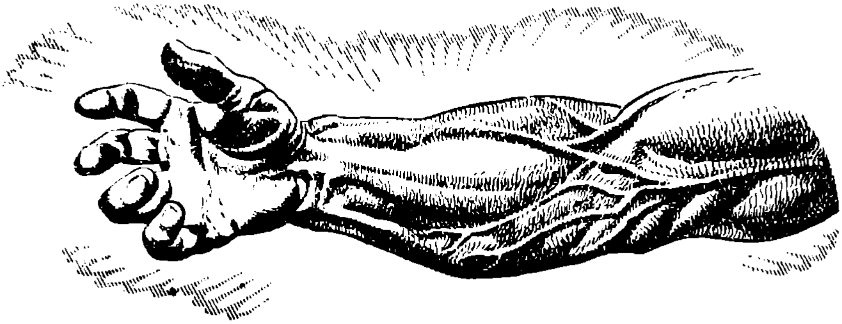

ভিড় করো না কেউ

—শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

সুন্দর পৃথিবীতে আমরা মানুষের মত বাঁচতে এসেছি, শুধু ভিড় করতে আসিনি ; অর্থাৎ এক কথায় শুধু ব্যারামে ভুগবার জন্য বা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাবার জন্য আমাদের জন্ম নয়। কিন্তু মানুষের মত বাঁচতে হলে আমাদের চাই—পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। তাই কোন্ আদিম যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি মানুষের দরকার হয়ে আসছে অর্থ, পুষ্টিকর খাদ্য ও বাসস্থানের সাধনা। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই কাজগুলো আনন্দের সঙ্গে মাথায় তুলে নিয়েছে।

কিন্তু কাজ যাঁরাই করুন, শরীর যদি তাঁদের ভেঙ্গে যায়, তা হলে তাঁরা আর পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবেন কদিন? কাজেই সব-কিছুরই মূলে হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা।

এই কথাটা একেবারেই নতুন নয় ; বরং বিষয়টি এত পুরানো ও নানাভাবে এত বেশী আলোচিত হয়েছে যে, সাধারণ ইস্কুলের নীচু শ্রেণীর একটি ছাত্রও হয়তো এ সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে পারে !

তবু কারো কারো মনে খুব একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস, যে সকল লোক—তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন,—অর্থোপার্জ্জনের জন্য অথবা গৃহস্থালীর কাজের জন্য সারাদিন কঠিন কায়িক পরিশ্রম করেন,

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁদের আর কোন ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই; কিন্তু তাঁদের এই ধারণা যে কত বড় ভুল, একটু বিচার করে দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়।

কায়িক পরিশ্রম যাঁরা করেন, ভাল করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সারাদিন সেই কাজ করার ফলে তাঁদের কতকগুলি পেশীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অত্যধিক পরিশ্রম হয়, তাই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু কতকগুলি পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদৌ কোন পরিশ্রম হয় না, সেইজন্য তারা একেবারেই বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

একে ব্যায়াম বলা চলে কি?

মোট কথা, ফল দুদিকেই হয় খারাপ। কতকগুলি পেশী অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য হয়ে পড়ে ক্লান্ত, আবার কতকগুলি বা চির-বিশ্রামের জন্য একেবারেই অপুষ্ট থেকে যায়।

পাথর-ভাঙ্গা কুলী শুধু পাথর ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথবা কারখানায় কামার দিনরাত শুধু হাতুড়ী পিটছে ঠক্‌ঠক্! পরিশ্রম তারা খুবই করে; কিন্তু তার ফলে বাহুর মাংসপেশী দৃঢ় হলেও যেন ক্লান্তিতে এলিয়ে থাকে!

একজন টাইপিষ্টের খাটুনিও কম নয়; টেলিগ্রাফ-মাষ্টারের কাজেও পরিশ্রম খুব বেশী; কিন্তু সেই পরিশ্রমকে কখনো কি ব্যায়ামের পর্য্যায়ে ফেলা যায়? না। তাতে অঙ্গ-বিশেষের পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু ব্যায়াম হয় না। ব্যায়ামের সঙ্গে দেহ-চর্চ্চার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও জড়ানো থাকে। কিন্তু পাথর-ভাঙ্গা কুলীর পরিশ্রমে, কামারের পরিশ্রমে, টাইপিষ্টের পরিশ্রমে বা টেলিগ্রাফ-মাষ্টারের পরিশ্রমে কি দেহ-চর্চ্চার কোন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ থাকে? তা থাকে না

এর নামও ব্যায়াম নয়।

বলেই তাদের ব্যক্তিগত কাজে পরিশ্রম হলেও ব্যায়াম হয় না। কাজেই দেখা যায়, সে সব কাজে কখনো শরীরের পুষ্টি হয় না। যদিও পেশীগুলি অনেক সময় দেখতে শক্তিশালী বলে মনে হয়, তবু তাতে জীবনীশক্তি খুব কমই থাকে; অর্থাৎ তাদের পরিশ্রমের ফলে পেশীগুলি কমনীয় ও সুন্দর হয়ে ওঠে না, সেগুলি হয়ে পড়ে ক্লান্ত। একজন ব্যায়াম-বীরের সঙ্গে এইটুকুই তাদের তফাৎ!

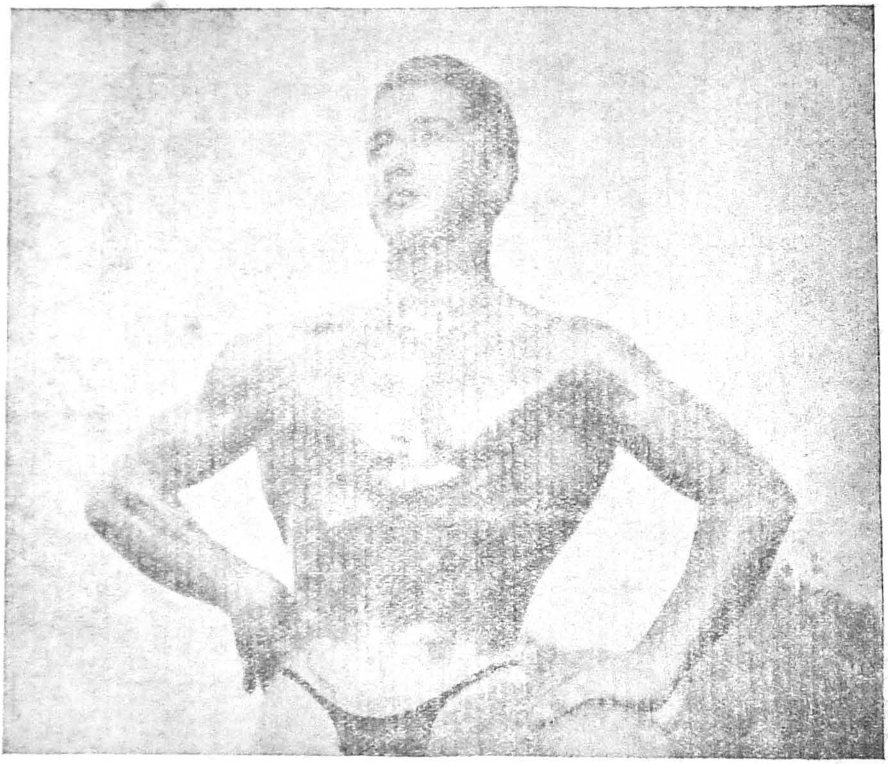

মাইকেল ক্রেভার। দেহ-মনে যেন নাচের হিল্লোল।

এইখানে এক পাশ্চাত্য ব্যায়াম-বীরের ছবি তুলে দিচ্ছি। মাইকেল ক্রেভার এঁর নাম। দেহের প্রত্যেকটি মাংসপেশী কেমন সুগঠিত ও সুন্দর! বিশ্রাম-নিরত মূর্ত্তি—মাংসপেশীর এখন কোন স্পন্দনই নেই। তবু মনে হয় দেহের ওপর দিয়ে

এইমাত্র বুঝি কোন নাচের ছন্দ বয়ে গেছে! নাচ থেমে গেছে বটে, কিন্তু ছন্দের মূর্চ্ছনা বুঝি এখনো তাঁর দেহ-মনে ঢেউ খেলে যাচ্ছে!

ব্যায়াম-বীর মনতোষ রায়। ধানুকা ব্যায়ামেও তাঁর মাংসপেশী সৌন্দর্য্যে ফেটে পড়ছে।

এর পর কলকাতার এক বাঙ্গালী ব্যায়াম-বীরের ছবিও একখানি দেওয়া হলো। নাম এঁর শ্রীযুক্ত মনতোষ রায়। তিনি তাঁর পেশীবহুল সুগঠিত দেহ দিয়ে ধনুকে তীর যোজনা করছেন।

অতি হাল্‌কা এই ব্যায়াম; তবু মনে হয়, তাঁর অতি ক্ষুদ্র মাংসপেশীটি পর্য্যন্ত যেন তাঁর সকল সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়ে ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জীবন-যৌবনের জয়গান করছে! সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বাঁচবার অধিকারী শুধু এঁরাই!

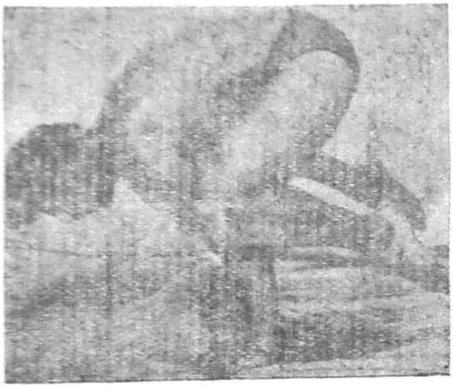

শুধু হাতেও ব্যায়াম করা যায়।

ব্যায়াম মানে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানারূপ চালনা দ্বারা শরীরে ক্লান্তি আনা ও খানিকটা ঘাম বার করা হতো—যা সাধারণ লোকের ধারণা,—তা হলে যাঁরা সারাদিন কঠিন কায়িক পরিশ্রম করেন, তাঁদের আর ব্যায়ামের প্রয়োজন হতো না; কিন্তু ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরে জীবনী শক্তি বাড়ানো, ক্লান্ত অবসন্ন পেশীগুলির অবসাদ দূর করা, অলস পেশীগুলিকেও পরিশ্রম করানো, আর রুগ্ন অথবা অপরিপুষ্ট আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিকে সুস্থ ও কর্ম্মপটু হতে সহায়তা করা। ব্যায়ামের উদ্দেশ্য যদি এই হয়, তা হলে কয়জন বলতে পারেন যে আমার ব্যায়াম করার প্রয়োজন নাই? আর কোন রকম ব্যায়াম না করে পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই বা থাকতে পারবেন কয়জন?

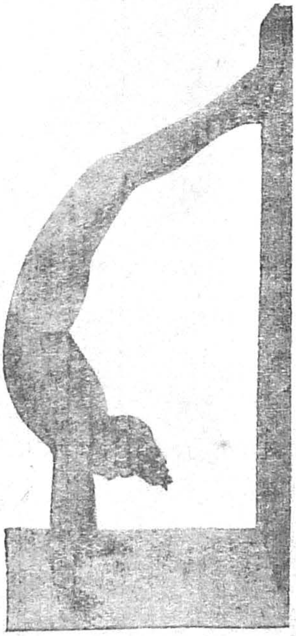

ব্যায়াম মানেই ডাম্বেল ভাজা নয়।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, ব্যায়াম মানেই হচ্ছে ডাম্বেল ভাঁজা, না হয় কুস্তি করা, না হয় জিমন্যাস্টিক করা, ইত্যাদি। শুধু হাতে বা সাধারণ একখানি

চেয়ার নিয়েও যে কত ব্যায়াম করা যায়, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য কয়েকখানি ছবি দেওয়া হলো।

এত কথার পরেও ব্যায়াম করার জন্য কেউ যদি সময় না পান, তা হলে তিনি ধনী কি নির্ধন—কায়িক পরিশ্রম-কারী কুলী-মজুর, কি শুধু মস্তিষ্কের চালনাকারী আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক অথবা শেয়ার-বাজারের ব্যবসায়ী, যাই হোন না কেন,—শীঘ্রই তাঁকে শত-সহস্র বিশেষ কাজ থাকতেও, সব কাজ ফেলে পৃথিবী থেকে অসময়ে চলে যাবার সময় দিতে হবেই।

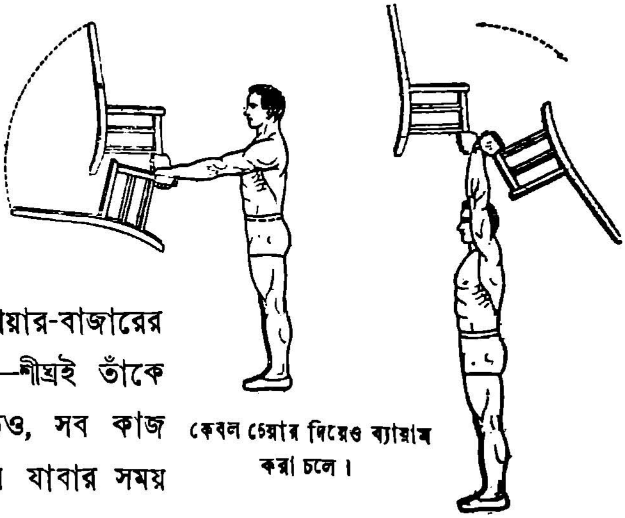

কেবল চেয়ার দিয়েও ব্যায়াম করা চলে।

কোন ওজর, কোন আপত্তি, সেদিন আর তাঁর চলবে না···চলবে না। স্বাধীন ভারতের আবহাওয়ায় এরকম লোকের ভিড় করবার কোন সার্থকতাও নেই;··· যত শীগ্‌গির হয়, এসব ব্যারামের ডিপো মহাপুরুষদের দেশ থেকে বিদায় নেওয়া খুব সঙ্গত।

যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা এবং শত্রু দ্বারা নিহত হওয়া সাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা এবং সেজন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করা তাহার অপেক্ষা বেশী সাহসের কাজ।

আবাহন

[অশীতিপর বৃদ্ধ কবির কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত]

—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ওরে শিশুর দল !
দে ছুঁয়ে দে কলম আমার
ভাবের ঘোরে কলম হবে কাঁচা ;
কোনদিনই আমরা তোদের করিনি ত' মানুষ,
তোদের ছোঁয়ায় তোরাই মোদের বাঁচা।

ভুবনভরা যত গরলরাশি
তাই ঘেঁটে মোর জীবন হ'ত সারা,
ছেলেখেলা ব'লে যারে হেলার সাথে উড়াই,
সেই ত আজো দেয় না মোদের হ'তে লক্ষ্যহারা !

বাগান ভরা লাল গোলাপের মতো,
তোদের খালি দেখ্‌ছি চোখে-চোখে,
শুকতারার অই কচি কিরণ-সাথে
মন ভরেছিস্‌ হাসিতে আলোকে !

কাঁচের মোহে সবাই আজি ভুলেছে কাঞ্চন,
মানব-হিয়া আত্মঘাতে মরে,
উড়া তোদের জয়ধ্বজা এমনি মধুর কালে
সাহিত্যের অই উঁচু দেউল 'পরে !

———

সেবক

—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের কথা। ইতিহাস-বিখ্যাত তব্রুকের রণক্ষেত্রে তখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে শত শত মাইলব্যাপী মরুর বুকে আগুনের হল্‌কা ছুটছে; হু-হু শব্দে ধূলা-ঝড় বইছে; উত্তপ্ত বালুকণার ঝাপ্‌টায় ঝলসে যাচ্ছে মানুষ ও জীবজন্তুর দল।

দুই পক্ষের সৈন্যদল শত শত ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিস্তীর্ণ মরুর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানে স্থানে মূল-শিবির স্থাপিত হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে আশে-পাশে দশ-বিশ মাইল দূরে দূরে ছোট ছোট শিবির স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক শিবিরে সৈন্যদলের সঙ্গে সর্ব্ববিধ যুদ্ধ-সরঞ্জাম, খাদ্য-ভাণ্ডার, চিকিৎসালয়, চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর দল প্রেরিত হয়েছে।

তাদের মাথার উপরে মাঝে মাঝে উড়ছে পর্য্যবেক্ষণকারী, বোমাবর্ষণকারী ও সংগ্রামকারী বিমান-দল। চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করছে ট্যাঙ্ক, মোটর লরী, বাস্। মূল-শিবিরের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ তাদের রয়েছে সরবরাহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা।

মূল-শিবির থেকে বেতারে ক্ষণে ক্ষণে আদেশ আসছে—"এগোও"···"পিছোও"···"সতর্ক হও। শত্রু-বিমান আসছে।"

সেই আদেশ অনুসারে সমস্ত দলকে কখনো অগ্রসর হতে, কখনো বা পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে। সময় সময় আদেশ-মত আক্রমণ বা আত্মসমর্পণও করতে হচ্ছে।

কখনো গভীর রাত্রে বিশ্রামোদ্যত সেনা-বাহিনীকে অকস্মাৎ আতঙ্কিত করে, বেতারে ধীর-গম্ভীর আদেশ আসছে,—"আজ রাত্রে কেউ ঘুমিও না। বুট-পট্টি পরে সবাই প্রস্তুত হয়ে থাক। সামনে শত্রু-সেনাবাহিনী সসজ্জ হচ্ছে। হয়ত তারা এখনি এগিয়ে এসে আকস্মিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করবার সুযোগ খুঁজছে! তাদের অভিসন্ধি টের পাওয়া মাত্রই সঙ্কেত করা হবে। তৎক্ষণাৎ শিবির তুলে সবাই পশ্চাদপসরণের জন্য প্রস্তুত থাক। সতর্ক থাক।"

তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত উত্তেজনায় জেগে ওঠে হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ির মত্ত-মাতন। ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেকে সম্পাদন করে নিজ নিজ কর্ত্তব্য। দর-বিগলিত ধারে ঝরে ঘাম, উত্তেজনায় মুখ হয় আরক্ত। দৌড়-ঝাঁপ ও আশঙ্কা-উদ্বেগে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলচেতাদের নিঃশ্বাস বয় ঝড়ের মত! কিন্তু অভিযোগের অধিকার নাই। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে রণ-ক্ষেত্রে এসেছে সবাই। মাসান্তে পায় মোটা বেতন,—আদেশ-পালনের পারিশ্রমিক। অতএব আদেশ পালন করতেই হবে।

সাহসী, দৃঢ়চেতাদের কাছে শুধু বাঁচাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায়, নির্ভীক খেলোয়াড়ের উচ্চতর মনোবৃত্তির পরিচয়ও অনেকে দিতে জানে। তারা বীরের মত মারে ও নির্ভয়ে মরে। কাপুরুষতা ও ভীরুতাকে তারা ঘৃণা করে। তবু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মানে,— সতর্ক থাকে।

কিন্তু যত সতর্কই থাক, অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায় না সবাই। হঠাৎ মিত্রপক্ষের একদল সৈন্যসহ একটা যুদ্ধ-হাসপাতাল, শত্রুপক্ষ অর্থাৎ জার্ম্মাণরা অবরোধ করলে। সরবরাহ-পথ বন্ধ হলো, স্বপক্ষীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। নিরুপায়!

সেখানকার হাসপাতালের তত্ত্বাবধান-ভার ছিল এক বাঙালী ডাক্তারের উপর। সকলে তাঁকে 'লেফ্‌টেনাণ্ট চক্রবর্ত্তী' বলত।

বেতারে আদেশ এল—"আত্মসমর্পণ কর।"

সৈন্যদল সহ সমস্ত হাসপাতালের কর্ম্মচারী ও ডাক্তার আত্মসমর্পণ করলেন। জার্ম্মাণরা নিজেদের মোটর ও লরীতে বন্দীদের প্রহরী-বেষ্টিত করে নিয়ে নিজেদের বন্দীশালার উদ্দেশে ছুটল।

(২)

বন্দীদের নিয়ে জার্ম্মাণ রক্ষিবাহিনী বিজয়-উল্লাসে নিজেদের শিবির-উদ্দেশে মোটর, বাস, লরী বোঝাই করে ছুটেছে। পথের আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে তাদের শত্রুর গুপ্তচর কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না, তারা তা জানত না। হয়ত কেউ ছিল, হয়ত বা কেউ ছিল না।

কিন্তু কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল, কিছু বোঝা দায়। অকস্মাৎ ছুটন্ত মোটরগুলার গর্জ্জন ডুবিয়ে দিয়ে, সামনের আকাশ-পথে গর্জ্জে উঠল মিত্রপক্ষের বোমারু বিমান। ঘূরপথে চক্র দিয়ে এসে হঠাৎ তারা সামনের পথে আবির্ভূত! সঙ্গে এক ঝাঁক লড়ায়ে বিমান!

জার্ম্মাণ সেনাদলের দলপতি মহাশয়রা যে সামনে ও পিছনের মোটরে বসে বন্দীদের সযত্নে আগলে নিয়ে চলেছেন, সে খবর বোমারু বিমান-বাহিনীর দল টের পেয়েছিল। বিনা বাক্যে এসেই তারা সামনের ও পিছনের মোটরগুলার উপর মেশিনগানের গুলি চালাল। শব্দ শোনা গেল, "কট্ কট্ কট্!"

সঙ্গে সঙ্গে দলপতিগণ সাঙ্গোপাঙ্গসহ থেঁৎলে পঞ্চত্বলাভ করলেন! আহতগণের আর্ত্তনাদে মরুভূমি কেঁপে উঠল।

মাঝপথে বন্দীবাহী যন্ত্রযানগুলি থমকে দাঁড়াল। আরোহী ও চালকদল চোখের উপর হাত ঢাকা দিয়ে রৌদ্র-ঝলক আড়াল করে উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখলে, সর্ব্বনাশ! বোমারু ও লড়ায়ে বিমানের দল এবার তাদের লক্ষ্য করেই তেড়ে এসেছে!

আর্ত্তনাদে মরুভূমি কেঁপে উঠল।

জার্ম্মাণ রক্ষী ও চালকদল তৎক্ষণাৎ গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট! পথের বাঁ-দিকের ঝোপ-ঝাড়, বালুস্তূপ, খানা-খন্দের আড়ালে তারা লুকিয়ে পড়ল।

বোমারু বিমানদল তাদের লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করলে। বিপক্ষদলের কতকগুলি হতাহত হয়ে মরুর বুকে লুটিয়ে পড়ল। স্বপক্ষের প্রতিও পক্ষপাতিত্বের অবকাশ তখন ছিল না। তারাও কেউ কেউ মারা গেল, কেউ আহত হলো।

অসহায়—অরক্ষিত অবশিষ্ট বন্দীরা হতভম্ব!

একটা শার্পনেলের টুকরো ছিট্‌কে এসে বিঁধল বন্দী বাঙালী ডাক্তারের ললাটে। উৎকট যন্ত্রণায় ক্ষণেকের জন্য তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন; কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হলো, এটা সংগ্রাম-ক্ষেত্র! এখানে হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাসের সময় নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণপণে-সচেতন থাকা চাই!

প্রবল শক্তিতে আত্মদমন করে ডাক্তার মাথা তুলে বসলেন। মনে হলো দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে—চোখে স্পষ্টরূপে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু অনুভব করলেন, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও কানে পৌঁছাল বিশৃঙ্খল কোলাহল!

মুহূর্ত্ত পরে আবার কানে এলো পরিচিত নার্সিং সিপাহীর উচ্চ কণ্ঠস্বর, "এই তো পালাবার মওকা! নেমে পড়ুন ডাক্তার, ছুটে চলুন ডাইনের মরুভূমি দিয়ে। ওই ময়দানটা পেরুলেই আমরা মিত্রপক্ষের এলাকায় পৌঁছাব।"

লাল-মুখ কালো-মুখ—সব বন্দী মুহূর্ত্তে ছুড়্‌দাড়্‌ শব্দে নেমে পড়ে ডাইনের মরুপ্রান্তরে লাফিয়ে পড়ল। উর্দ্ধশ্বাসে সবাই ছুটল। রক্তাক্ত কপালে রুমাল চেপে ধরে ডাক্তারও নামলেন, অতি কষ্টে সকলের পিছু পিছু ছুটলেন।

ধীরে ধীরে যন্ত্রণার তীব্রতার হ্রাস হলো। স্মরণ হলো, প্রান্তরটা পেরিয়ে যেতে পারলে মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত একটা প্রধান পথ পাওয়া যাবে বটে। সেখানে প্রায় সর্ব্বদা যান-বাহন চলাচল করছে। সেখানে পৌছাতে পারলে, একটা হাসপাতাল কাছেই পাওয়া যাবে।

উৎসাহ ও আশায় উত্তেজিত হয়ে ডাক্তার প্রাণপণ শক্তিতে ছুটলেন।

(৩)

উদ্বেগের তাড়ায় সবাই ভুলে গেল, এই সকল প্রান্তরের স্থানে স্থানে, নির্ব্বিঘ্নে শত্রু-নিপাতের উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই বালুকার অন্তরালে মাইন-ক্ষেত্র রচনা করে রেখে দিয়েছেন। দৈবাৎ সেরূপ কোন মাইন-ক্ষেত্রে গিয়ে পড়লে, মাইনগুলি সামান্য পায়ের চাপ পেলেই সশব্দে ফাটবে। তারা সজীব, অব্যর্থ-সন্ধানী গুপ্তঘাতক! তারা শত্রুমিত্র বিচার করে না, আঘাত করে নির্ব্বিচারে!

পলাতক বন্দীদল প্রান্তরের অর্দ্ধাংশ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করার পর, হঠাৎ সামনের দলের পায়ের নীচে শব্দ হলো, "দুম্ দুম্ দুম্!"

মুহূর্ত্তে কয়জন আহত হয়ে আর্ত্তনাদ করে বালুর উপর লুটিয়ে পড়ল! আর সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দল থমকে দাঁড়াল! সামনে তাহলে মাইন ক্ষেত্র? মাইন ফেটেছে?

পিছনের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান্! ওটা যে আমাদেরই মাইন-ক্ষেত্র! আমরাই সেদিন ওখানে মাইন পুঁতেছি!"

আর একজন কটূক্তি করে বললে, "কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা উচিত ছিল না কি? কর্ত্তৃপক্ষের যেমন কাণ্ড! ঘায়েল হলো এখন নিজেদের লোক! পালাও, পালাও সব! দাঁড়াবার সময় নাই। এখুনি শত্রুর বন্দুকের গুলি পিঠ ফুঁড়ে ফুস্‌ফুস্ ঝাঁঝ্‌রা করে দেবে। ছোট সবাই!"

মাইন-ক্ষেত্রের পাশ কাটিয়ে তারা সটান লক্ষ্যস্থানের অভিমুখে ছুটল।

পিছনে মাইন-ক্ষেত্রে নিপতিত আহতগণের কাতর আর্ত্তনাদ বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনিত হলো, "দোহাই ঈশ্বরের, জল দাও, একটু জল! প্রাণ বাঁচাও!"

পলাতকদের কারু কানে সে কথা পৌছাল, কারু কানে পৌছাল না; কিন্তু কেউ ফিরে চাইলে না। তারা ছুটে চলল নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

(৪)

সকলের শেষে আহত কপালে রক্তাক্ত রুমাল চেপে ধরে স্খলিত চরণে টলতে টলতে এসে বাঙালী ডাক্তার পৌঁছালেন। তাঁর সঙ্গে কেউ নাই।

আহতদের অবস্থা দেখে, নিজের যন্ত্রণা তিনি ভুলে গেলেন। তিনি দাঁড়ালেন। হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেন। হায়, কোন সাহায্যের আশা কোন দিকে নাই! এতগুলি প্রাণী নিরুপায়! শুধু নৈরাশ্যে যন্ত্রণার পীড়নে মারা যাবে? না, আঘাত এদের তেমন মারাত্মক নয়। উপযুক্ত চিকিৎসা-শুশ্রূষা হলে এরা বেঁচে যাবে; কিন্তু বর্ত্তমানের এই অসহায় নিরুপায় হতাশ-ক্লান্ত যন্ত্রণার মুহূর্ত্তগুলা এদের জীবনী শক্তিকে দ্রুত হ্রাস করে দিচ্ছে যে! এদের মনোবল ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে; আতঙ্ক, উদ্বেগ ও পীড়নে প্রতি মুহূর্ত্তেই স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বলতর হচ্ছে;—এরা আঘাত সামলে বাঁচবে কিসের জোরে?

মুহূর্ত্তে স্মরণ হলো, তিনি নিজেও একজন মানুষ!—খুব আহত হয়েছেন, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, হাত-পায়ের শক্তি বিবশ-বিকল বোধ হচ্ছে; কিন্তু কর্ত্তব্য তাঁর—কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী আর্ত্তের সেবা করা!—তিনি সেবক! বেতনভোগী বটে তবু সেবক।

আজ এখানে কর্ত্তৃপক্ষ কেউ নাই। আদেশ, নির্দ্দেশ দেবার কেউ নাই। থাকলে, তাঁরা হয়ত অবস্থা বিবেচনা করে, আত্মরক্ষার জন্যই আগে উপদেশ দিতেন।…ওই…ওই তো দূরে রাস্তায় শত্রুদের মোটরগুলা এখনো দাঁড়িয়ে আছে! শত্রুদল ওরই কাছাকাছি লুকিয়ে আছে। নিতান্তই মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানগুলা এখনো আকাশ-পথে ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে মাঝে বোমা ফেল্‌ছে, তাই ওরা গুপ্তস্থান ছেড়ে বেরুতে পারছে না। নচেৎ এতক্ষণে তেড়ে এসে পলাতকদের নিশ্চিহ্ন করে দিত! ওদের আটকে রেখেছে, ওই বোমারু দল! বোমারুরা একবার সরলেই, ওরা আক্রমণ করতে আসবে।

আসুক! তবু আহতদের সুব্যবস্থার জন্য যতটা ক্ষমতায় কুলায়, চেষ্টা করতেই হবে। এরা লাল-মুখ কি কালো-মুখ, সেটা এখন দেখবার দরকার নাই। এরা আহত,—এই পরিচয়ই যথেষ্ট।…আর তিনি? তিনি কতটা ভারতীয়, কতটা হিন্দু, কতখানি ব্রাহ্মণ, সেটা নিক্তির ওজনে বিচার করবারই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এখন নিজের অন্তর্যামীর কাছে প্রমাণ করা—তিনি কতটা মানুষ!

লেফ্‌টেনান্ট চক্রবর্ত্তী তাঁর কাঁধ থেকে হ্যাভারস্যাক, জলপাত্র, ঝোলাঝুলি নামিয়ে মাইন-ক্ষেত্রে ঢুকলেন। সাবধানে অগ্রবর্ত্তী দলের অর্থাৎ আহতগণের পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন। বালুর

উপর যেখানে যেখানে সুস্পষ্ট পদচিহ্ন দেখা গেল, বোঝা গেল সেখানে মাইন নাই। সাবধানে তাঁর উপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আহতদের একে একে তুলে আনলেন।

মাইন-ক্ষেত্রের বাইরে তাদের পাশাপাশি শোয়ালেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জলপূর্ণ পাত্র ছিল, শুধু তাদের নিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। চক্রবর্ত্তী তাদের জল পান করালেন, নিজের ঝোলা থেকে ঔষধপত্র নিয়ে তাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

"আঃ, বাঁচালে ডাক্তার, ধন্যবাদ!"

সুস্থ হয়ে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে আহতগণ বললে, "ধন্যবাদ ডাক্তার, এবার নিজেকে বাঁচাও।"

"তোমাদের বাঁচিয়ে বাঁচতে চাই।—ঐ ছ্যাখো বন্ধু, আর ভয় নাই। মিত্রপক্ষের বোমারু বিমান শত্রুদলকে নির্ম্মূল করে দিয়েছে। আর এক প্রাণীও অবশিষ্ট নাই। সাহসে ভর করে তোমরা একটুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমি বড় রাস্তায় পৌছে তোমাদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করে পাঠাচ্ছি। এখনি তোমরা হাসপাতালের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে যাবে। ভয় নাই।"

"আঃ, বাঁচালে ডাক্তার, ধন্যবাদ!"

ডাক্তার রক্তাক্ত রুমালখানা আবার কপালে চেপে ধরে অগ্রবর্ত্তী পলাতকগণের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে বড় রাস্তার উদ্দেশে টলতে টলতে ছুটলেন।

(৫)

অল্পক্ষণ পরে মিত্রপক্ষের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী এসে উপস্থিত হলো—আহতদের তুলে নিয়ে গাড়ী হাসপাতালে ছুটল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। গাড়ী এসে হাসপাতালে পৌছাল। আহতদের ষ্ট্রেচারে তুলে বহন করে এনে অন্য রোগীদের পাশাপাশি শোয়ান হতে লাগল। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর দল ঔষধপত্র নিয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হলেন।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একজন রোগী নিঝুম হয়ে এক প্রান্তে বিছানায় পড়ে ছিলেন। নবাগতদের আগমনে তিনি ঘাড় তুলে চাইলেন। পাশের শয্যায় তখন একজন ভারতীয় সিপাহীকে শোয়ানো হচ্ছিল। রোগীটি ক্লান্ত কাতর কণ্ঠে সিপাহীকে ডাকলেন, "দেশোয়ালি ভাই!"

সিপাহী উত্তর দিলে, "ভাই!"

"মাইনের আঘাতে যারা আহত হয়েছিলে, তারা সবাই এসেছ?"

সিপাহী চমকে তাঁর দিকে চেয়ে বললে, "সবাই। কে আপনি? অ! লেফ্‌টেনাণ্ট চক্রবর্ত্তী! আহা, আপনিও আহত? কতক্ষণ?"

অবসাদ-শ্রান্ত কণ্ঠে চক্রবর্ত্তী বললেন, "তোমাদের আগে।"

"আহা, সে আঘাত অগ্রাহ্য করেই আমাদের জন্য এত খেটেছেন! আজ আপনার জন্যই আমরা পুনর্জ্জীবন পেয়েছি।...ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

পাশাপাশি শয্যায় দু-তিনজন নবাগত আহত কাৎরে উঠল, "বড় যন্ত্রণা...উঃ, বড় যন্ত্রণা!"

শ্রান্ততর কণ্ঠে চক্রবর্ত্তী বললেন, "হায় রে, আমাকে অকর্ম্মণ্য করে দিলে এ সময়!—আঃ! মানুষের লোভ কি নিষ্ঠুর! বর্ব্বরতার অত্যাচার কি উগ্র! সমস্ত পৃথিবীটা আজ যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত!"

সেবকদল সেই সময় একজন আহত ভারতীয় সেনাধ্যক্ষকে বহন করে নিয়ে এল। তাঁর বাঁ পাখানা আহত অবশ হয়ে ঝুলছে। চক্রবর্ত্তীর দিকে চেয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত অভিবাদন করে ধীর স্বরে বললেন, "কিন্তু মানবতা এখনো মরেনি। তার স্বর্গীয় মহিমা রুক্ষ-তপ্ত মরুর বুকেও অমৃত-ধারা বর্ষণে কৃপণতা করে না, তাও দেখবার সুযোগ পেয়েছি ডাক্তার!"

চক্রবর্ত্তী চোখ বুজলেন। শ্রান্তি-বিকল দেহযন্ত্র প্রবল অবসাদে ঝিমিয়ে আসছিল। তবু মনে হলো, আঃ! এ সময় যদি তিনি সুস্থ থাকতেন! এতগুলি যন্ত্রণার্ত্ত জীবের যন্ত্রণা উপশমের জন্য অন্ততঃ কিছু চেষ্টা করে ধন্য হতেন!

আর একজন ভারতীয় ডাক্তার এসে তাঁর ধমনী-গতি পরীক্ষা করে ঔষধ খাওয়ালেন। সাদরে তাঁর বুক চাপড়ে বললেন, "উদ্বেগ-চাঞ্চল্য ত্যাগ করুন। Don't worry. Do your duty. Come what may. ঘুমিয়ে পড়ুন। আহতদের জন্য আমরা আছি।" [সত্য ঘটনা অবলম্বনে।]

অহিংসা দুর্ব্বলের অস্ত্র নহে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোকের অস্ত্র। অহিংসার বল মাংসপেশীর বল নহে, হৃদয়ের বল।

মহাত্মা গান্ধী

হীরে-জহরৎ

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দুর্ভিক্ষের ফলে প্রজাপতির আগমন—

আদিযুগে য়ুরোপে প্রজাপতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আফ্রিকায় ছিল নানা জাতের প্রজাপতির বাস। তৃতীয়-শতাব্দীতে আফ্রিকায় প্রজাপতিদের রাজ্যে ঘটলো দারুণ দুর্ভিক্ষ;—তখন তারা ছোট-ছোট ডানায় ভর করে উড়ে সাগর পার হয়ে ইতালী, ফ্রান্স এবং সেখান থেকে ব্রিটেনে এসে আস্তানা পাতে। ঐ দুর্ভিক্ষ না হলে আফ্রিকা থেকে প্রজাপতিরা য়ুরোপে আসতো কি না, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মনে সন্দেহের সীমা নেই!

মিশরের পিরামিড—

হিসেব করে দেখা গেছে, যে মাল-মশলায় ঐ পিরামিড তৈরী হয়েছে,—তা নিয়ে তিন-হাজার মাইল দীর্ঘ প্রাচীর গাঁথা চলে—চার ফুট চওড়া আর এক ফুট উঁচু প্রাচীর। পিরামিডের দেহ তেইশ-লক্ষ পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরী; প্রতি ব্লকের ওজন সত্তর মণ। এক-একখানি ব্লক রাখতে চাই প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি।

টাকার বদলে নুনের ড্যালা—

আফ্রিকার এথিয়োপিয়া-রাজ্যে কেনা-বেচার ব্যাপারে টাকার বদলে নুনের ড্যালার প্রচলন আছে—আজও, এ-যুগে। ভাঙ্গানি বা খুচরো দাম দিতে হলে ড্যালা ভেঙ্গে টুকরো করে দেওয়া হয়।

অক্টোপাসের গায়ের রং—

বহুরূপীর মতো অক্টোপাসেরও গায়ের রং বদলায়। সমুদ্রের নীলাভ জলে অক্টোপাসের গায়ের বর্ণ হয় নীলাভ; আবার বালির উপর উঠলে গায়ের বর্ণ হয় বালির মতো।

সব চেয়ে বড় ডিম—

রাজ-হাঁসের ডিম বেশ বড় হয়, অনেকে দেখেছো। অষ্ট্রিচের ডিম আকারে রাজহাঁসের ডিমের চেয়ে একুশ গুণ বড়। কিন্তু সব চেয়ে বড় যে ডিম পাওয়া গেছে, সে ডিম এপিয়োরনিশ পাখীর। এ পাখীর বাস ছিল মাডাগাস্কারে। এখন এ পাখীর জাত নিশ্চিহ্ন। এপিয়োরনিশের ডিম আকারে এত বড় ছিল যে তার খোলা ও-দ্বীপের লোক জল রাখবার কলসীর মতো ব্যবহার করতো।

মৃত্যুর পরে ফাঁসি—

অলিভার ক্রমওয়েলকে তাঁর মৃত্যুর পরে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ক্র্যাকাটুয়ার আগ্নেয়গিরি—

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ আগষ্ট তারিখে ক্র্যাকাটুয়া-দ্বীপের অগ্নি-গিরি পিক্ পার্বুয়াটান্ ফেটে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এত প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেনি! ক্র্যাকাটুয়া একটি ছোট দ্বীপ—সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের মধ্যে যে সুণ্ডা-অন্তরীপ, সেই অন্তরীপে অবস্থিত। এই অগ্ন্যুৎপাতে ৩৫৪৭ লোকের মৃত্যু ঘটে এবং পাহাড়-ফাটার শব্দ ৩০০০ মাইল দূরের রডব্রিক-দ্বীপের লোকেরাও সুস্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

ভুল নাম—

লেড্-পেন্সিলে একটুও 'লেড' বা সীসা নেই—আছে গ্র্যাফাইট্। জার্ম্মাণ-সিলভারে এক-রত্তিও সিলভার বা রূপো নেই! সোডা-ওয়াটারে সোডার একটি ছিটেও নেই! তাতে আছে অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ। যাকে আমরা শ্যাময়-লেদার বলি, আসলে সে হলো ভেড়ার চামড়া—শ্যাময়ের চামড়া নয়। ক্যামেল-হেয়ার-ব্রাশে ক্যামেল বা উটের লোম আদবে নেই। তিমি কখনও মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জীব।

যে-কথা কেউ বলে না—

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পীয়ের লোটিকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অভিনন্দন দান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে পীয়ের লোটি বলেছিলেন,—জীবনে আমি কখনো কোনো বই পড়ি নি। তার কারণ আমার আলস্য এবং ভয়। ভয়, পাছে অপরের লেখা পড়লে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি!

জল কোথায় টক ?—

আমেরিকার কলরাডো-প্রদেশে এক অগ্নি-গিরির কাছে একটি নদী আছে। নদীর নাম এল্-রায়ো-ভিনিগার। এ হলো ইকোয়েডরের ককা নদীর শাখা। এল্-রায়ো-ভিনিগার নদী দৈর্ঘ্যে ৮০ মাইল। এই নদীর জল ভয়ানক টক—ভিনিগারের মতো। জলে আছে সালফিউরিক আর হাইড্রোক্লোরিক এসিড। জল এত টক যে নদীতে মাছ নেই। এত টক জলে মাছ বাঁচতে পারে না।

মানুষের মৃত্যুর হার—

পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর হার মিনিটে ৬৮; দিনে ৯৭৯২০; এবং বছরে ৩৫৭৪০৮০০। (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকলে নিশ্চয়ই আরো বেশি)।

খৃষ্টাব্দ গণনায় ভুল—

ইংরেজী বছর গোণা হয় যীশুখৃষ্টের জন্মকাল ধরে—অথচ যে-সময় থেকে খৃষ্টাব্দ গোণা হয়, তার চার বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মান নি, জন্মেছিলেন ৪ খৃষ্টাব্দে। গণনার এ ভুল কোনো দিন আর শোধরানো হয়নি !

মিথ্যা অপবাদ—

একটা কথা চলে আসছে যে রোমের সম্রাট নীরো "ফিড্ল্" বাজাচ্ছিলেন রোম যখন পুড়ে ভস্মসাৎ হচ্ছিল। কথাটা সত্য নয়। বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক টেসিটাস্ স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন—রোমে যখন আগুন লাগে, নীরো তখন ছিলেন রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আন্টিগ্রামে তাঁর যে বিরাম-নিবাস ছিল, সেইখানে। তাছাড়া নীরোর আমলে "ফিড্ল্"-যন্ত্রের সৃষ্টিই হয়নি !

অদ্বিতীয় পর্য্যটক—

মেনসেন আর্নষ্ট—নিবাস নরওয়ে। চরণ-জুড়িতে ভর করে তিনি দুনিয়া পাড়ি দিতে পারেন। পায়ে হেঁটে সারা য়ুরোপ যেন তিনি চষে ফেলেছেন ! প্যারি সহর থেকে পায়ে হেঁটে মস্কো পৌঁছেচেন ঠিক চৌদ্দ দিনে। পথে তেরোটি নদী ছিল; সাঁতরে এ-সব নদী পার হয়েছিলেন। কনস্তান্তিনোপ্ল্ থেকে তিনি আমাদের এই কলকাতাতেও এসেছিলেন—৫৬২৫ মাইল পায়ে হেঁটে পাহাড়-মরু-জঙ্গল মাড়িয়ে, সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে !

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট কে ?—

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জন্ হ্যান্‌শন্—জর্জ্জ ওয়াশিংটন নন্। হ্যান্‌শন্ থাকতেন মেরিলাণ্ডে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে যখন আর্টিকল্‌স্ অফ্ কন্‌কেডারেশন্ সহি হয়, তখন তেরোটি ষ্টেট্ মিলে প্রথম ইউনিয়ন সৃষ্টি করে এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে সমাগত এই তেরোটি যুক্ত ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হলেন জন্ হ্যান্‌শন্। এ কথা লেখা আছে ফিস্‌কের লেখা "ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড্‌স্ অফ অ্যামেরিকান হিষ্ট্রী" গ্রন্থে।

একটা কিছু লেখো

প্রতিযোগিতা

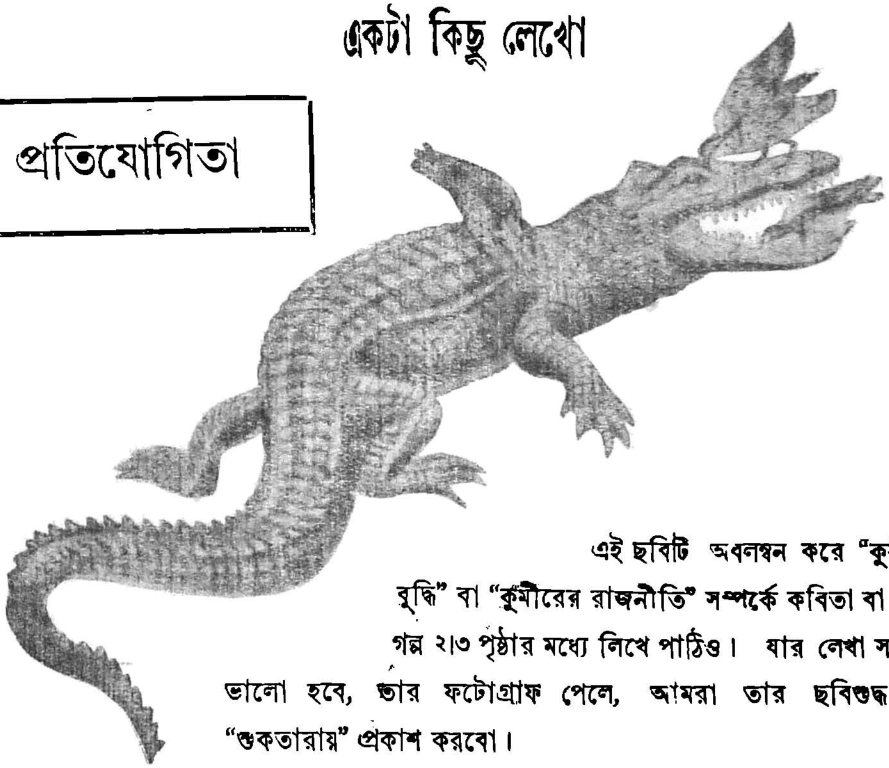

এই ছবিটি অবলম্বন করে "কুমীরের বুদ্ধি" বা "কুমীরের রাজনীতি" সম্পর্কে কবিতা বা ছোট গল্প ২।৩ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে পাঠিও। যার লেখা সবচেয়ে ভালো হবে, তার ফটোগ্রাফ পেলে, আমরা তার ছবিশুদ্ধ গল্পটি "শুকতারায়" প্রকাশ করবো।

গাহ ভারতের জয়

—শ্রীগৌরী দেবী

গাহ ভারতের জয়,
পূর্ব্ব-গগনে নব অরুণের হ'ল যে অভ্যুদয় ;
সব মলিনতা মুছে গেছে আজি,
ধরা আনন্দময় ;
গাহ ভারতের জয় !
ভুলি' জাতি-ভেদ হও আগুয়ান
দূরে যাক সব ভয় !

দেশের জন্য দশের লাগিয়া যায় যদি যাক্ প্রাণ,
মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে গো হয়ে ওঠো মহীয়ান্ ।
গাহ ভারতের জয়,
স্বদেশের লাগি' যাঁরা দিল প্রাণ তাঁরা ভুলিবার নয় ।

শত শহীদের অমর আত্মা মুক্তি লভিল আজি,
স্বাধীন ভারতে তাঁহাদের নাম দিকে দিকে ওঠে বাজি' ।
ভুলি' দলাদলি, কর কোলাকুলি,
হিংসার হোক শেষ ;
বল এক সাথে আল্লা ও যীশু,
দয়াময় পরমেশ !
গাহ ভারতের জয়,
সে সুরে কাঁপিয়া উঠুক পৃথ্বী কুমারিকা-হিমালয় ।

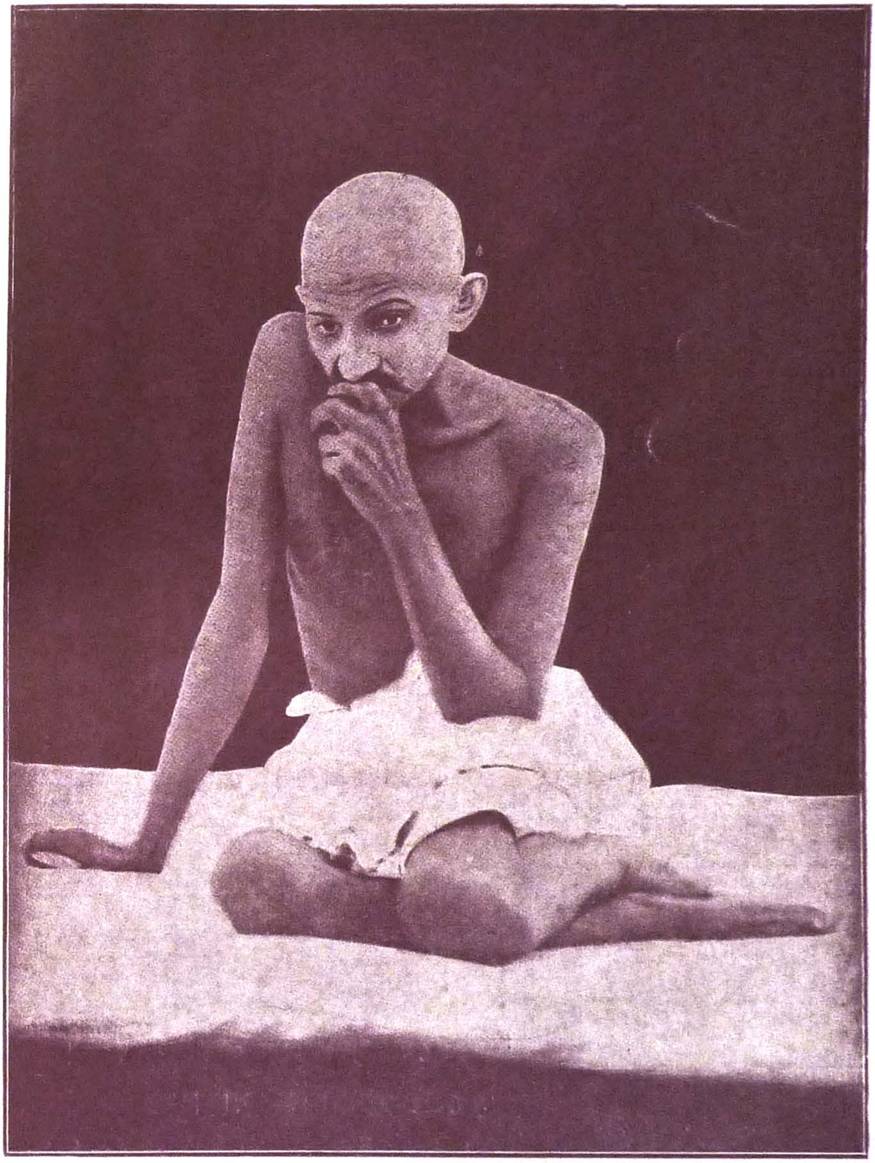

আবির্ভাব ঃ
২রা অক্টোবর, ১৮৬৯

মহাত্মা গান্ধী

তিরোভাব ঃ
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

ফেলো আঁখিজল

—শ্রীদীপক

হে বন্ধু, নয়নে যদি থাকে তব জল,
ফেলো আজি ফেলো তাই, ঢালো অবিরল।
শ্যামল ভুবনে আজি হলো বজ্রপাত,
পৃথিবীর গতি বুঝি রুদ্ধ অকস্মাৎ !
মহাত্মার মধুবাণী থামালো কে ভুলে,
লুটালো কে দেহ তাঁর যমুনারি কূলে ?
সুকোমল পুণ্যতনু কে বিঁধিল হায়
নিঠুর হৃদয়ভেদী অনল-ধারায় !
অর্দ্ধ-শতক ধরি' যাঁর সামগানে
ঝঙ্কারিত ছিল ধরা, মুখরিত তানে ;
আজিকে নীরব সেই, নিভে গেছে আলো,
ফেলো তাই আঁখিজল, যত পারো ঢালো।

হিংসার জগতে যেই অহিংসার বাণী
বিজলী-চমক সম দিয়ে গেলো হানি'
হিংসার অনলই তাঁরে গ্রাস করে হায়,
জ্বলন্ত সীসক বুকে ভূমিতে লুটায় !
কামনা তাঁহার ছিল,—আপনার জনে
বসাইবে দেবতার স্বর্ণ-সিংহাসনে ;
দেবত্ব লভিয়া তারা হোক্ গরীয়ান্
করে যেন পৃথিবীতে ভালবাসা দান !
এ হেন কামনা ছিল যাহাদের লাগি'
তাহারাই নিল কি রে অভিশাপ মাগি' !
তাহাদেরি একজন বিঁধিল রে তাঁয়,
শিহরি' কুঞ্চিত মুখে ধরণী তাকায় !

মহাত্মা গান্ধী

—শ্রীদীপক

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।—

বাংলা সেদিনও ছিল ভ্রাতৃ-বিরোধে বিধ্বস্ত। এমনই সময়ে নদীয়ার পথে পথে এক মহাপুরুষ ভগবানের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মানবতাই ছিল তাঁহার চরম লক্ষ্য, আর আর্ত্তকে সেবা করাই ছিল তাঁহার পরম ধর্ম্ম। তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বিধর্ম্মী শাসক নবাব হোসেন শাহও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচারে কোন বাধা সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাহার সুবন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত যুগের সেই মহাপুরুষের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বর্ত্তমান যুগেও আমরা তেমনই বা ততোধিক গরীয়ান্ এক মহাপুরুষের নাম সদম্ভে ঘোষণা করিতে পারি। তিনি মহাত্মা গান্ধী। এই দু'দিন আগেও তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন, কিন্তু আজ নাই!

ভ্রাতৃ-বিরোধে বিধ্বস্ত বাংলার পথে পথে সুদীর্ঘকাল যে কণ্ঠ মানবতার মহাবাণী প্রচার করিতেছিল, সে কণ্ঠ আজ নীরব। আজ মনে পড়ে, গত বছর ঠিক এমনই সময় নোয়াখালির পথে পথে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে—এই স্থবির, বৃদ্ধ, ক্ষীণদেহ, অর্দ্ধনগ্ন মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী, কেবল ভ্রাতৃপ্রেমের বীজমন্ত্র ঘোষণা করিয়া ফিরিয়াছিলেন। যে নৃশংস ভ্রাতৃহত্যার জঘন্য রক্তস্রোত বন্ধ করিবার জন্য সেদিন তিনি জীবন বিপন্ন করিয়া রক্তাপ্লুত নোয়াখালির ঘাটে-পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, মহাত্মা গান্ধী আজ স্বয়ং সেই ভ্রাতৃহত্যারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিরূপে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হইলেন!

ভ্রাতৃহত্যা যিনি বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি হইলেন আজ ভ্রাতৃহত্যার বলি! আর পরম দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে যাঁহাদিগকে মানুষ করিয়া ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য, তাঁহাদেরই একজন, তাঁহারই স্বধর্ম্মী এক হিন্দু তাঁহার নির্ম্মম আততায়ী!

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে, গুজরাটের সমুদ্রপুরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাবা গান্ধী ও মাতার নাম পুতলীবাঈ। গান্ধীজি ছিলেন তাঁহার মাতাপিতার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান।

পরবর্ত্তী জীবনে গান্ধীজি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, বাল্য জীবনে কোনরূপ অসাধারণত্ব তাঁহাতে দেখা যায় নাই। অতি সাধারণ ছেলের মতই তাঁহার লেখাপড়া, নিকৃষ্ট ছেলের মতই বিড়ি-সিগারেটে আসক্তি! কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল এইটুকু যে, একবার সঙ্কল্প করিলে বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, তখন তিনি হিমালয়ের মতই অটল গাম্ভীর্য্যের আধার হইয়া উঠিতেন!

সেই সঙ্কল্পের বশে তিনি ধূমপান পরিত্যাগ করেন এক মুহূর্ত্তে! আর যৌবনে ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, সেই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি একদিনের জন্যও মদ-মাংস স্পর্শ করেন নাই! কারণ, বিলাতে পাঠাইবার পূর্ব্বক্ষণে জননী পুতলীবাঈ পুত্রকে দিয়া তেমনই কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন!

ব্যারিষ্টার গান্ধীজি যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখনও কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, ইঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে একদিন ভারতের জনমত ভারত-মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় উন্মাদ ও উত্তাল হইয়া উঠিবে, আর বলদর্পী ব্রিটিশ-শক্তি অবশেষে পরাজিত কুকুরের ন্যায় অধোলাঙ্গুলে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইবে!

গান্ধীজির প্রথম বিজয় আফ্রিকার অভিযানে। দাদা আবদুল্লা নামে এক ব্যবসায়ীর মামলা লইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন তিনি আফ্রিকায় যাত্রা করেন, সেই দিনই বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার মস্তকে জয়-গৌরবের কণ্টক-মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিশ্বের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন!

আফ্রিকায় গিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন, ভারতীয়দের সেখানে কি দুরবস্থা! তাহারা ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতে পারে না, তাহাদিগকে রাস্তার একধারে নামাইয়া দেওয়া

হয়; তাহারা প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনিলেও, গার্ড আসিয়া তাহাদিগকে মাঝপথে নামিয়া যাইতে বাধ্য করে। শ্বেতাঙ্গ জাতির এই বর্ণ-বৈষম্যে তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ জানাইতে সুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে লাঞ্ছনার অধ্যায় আরম্ভ হইল আর মুক্ত-দুয়ারে কারাগারগুলি তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে লাগিল।

গান্ধীজি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুকাল পরেই সবরমতীতে এক সত্যাগ্রহ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। কারণ, তাঁহার মতে নিরস্ত্র ও অহিংস ভাবে প্রতিপক্ষের সহিত লড়াই করিবার একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র—সত্যাগ্রহ। আফ্রিকার আন্দোলনে একমাত্র সত্যাগ্রহ-পন্থায় তিনি যে বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাই তাঁহাকে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কেহই যথার্থ সত্যাগ্রহী হইতে পারে না। কাজেই তাঁহার এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা।

ইহার পর গান্ধীজির কর্ম্ম-বহুল জীবন যেন ক্রমশঃ নাটকীয়ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে! নীলকরদিগের অত্যাচার দমনের জন্য চম্পারণে তাঁহার সত্যাগ্রহ, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ডায়ার যে নৃশংস গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন তীব্রকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন, গুজরাটের বর্দ্দোলী তালুকে অহিংসভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন এবং অবশেষে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূলে তাঁহার অভিযান ইত্যাদিতে মহাত্মা গান্ধীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অতি দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সুতরাং মসৃণ ভাবে ভারত-শাসন সম্ভব করার জন্য ব্রিটিশ শক্তি পুনঃ পুনঃ এই মহাপুরুষটিকেই হস্তগত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিল; কিন্তু পুরুষ-সিংহ মহাত্মা গান্ধী, ইংরেজের কবলিত হওয়া দূরের কথা, বজ্রকণ্ঠে একদিন তাহাদিগকে কহিলেন, "ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও" (Quit India)।

পদদলিত সর্পের মত ইংরেজ শাসক ফুঁসিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ

দমন-নীতি আত্মবিকাশ করিল। তাহার ফলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন এমন ব্যাপক ও বিষময় হইয়া উঠিল যে, অবশেষে ইংরেজী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতীয়দের হাতেই পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ইংরেজ শক্তিকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তাহারা এমন সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইয়া গিয়াছে যে, সারা দেশ এখনও হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত।

হিংসা-দ্বেষের বিষময় ফলে দাঙ্গা, লুণ্ঠন ও নরহত্যার ব্যাপক তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া গান্ধীজি মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন এবং পুনঃপুনঃ কেবল তাহারই বিরুদ্ধে—শান্তির অভিযানে—দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু এমনই সময় এক অন্ধ সাম্প্রদায়িক, নাম তার নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে—পুণ্যশ্লোক মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে হত্যা করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী তারিখেও তিনি যথারীতি তাঁহার কর্ত্তব্য কাজগুলি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন ৩০শে জানুয়ারী তারিখে, অপরাহ্ণে, প্রার্থনা-সভায় যাইবার সময় সহসা এক আততায়ী তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে, সঙ্গে সঙ্গে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন চিরদিনের জন্য আমাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া গেল!

৩১শে জানুয়ারী পুণ্য-সলিলা যমুনার তীরে এক রাজকীয় শোভাযাত্রায় তাঁহাকে শেষ বিদায়-সম্ভাষণে অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অমর দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল রাখিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবানের পুত্র যীশুখৃষ্ট এইরূপে তাঁহারই দেশে অধিবাসীদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন; দুই সহস্র বৎসর পরে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী তাঁহারই দেশবাসী ও স্বধর্ম্মীর হাতে নিহত হইলেন! ভারতীয়দের এই লজ্জা ও মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—মহাত্মার অনুসৃত নীতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি-স্থাপন এবং চির-পদদলিত চণ্ডাল ও হরিজনদিগকে সাদরে গ্রহণ।

অন্তিম শয়নে মহাত্মা গান্ধী

শ্রদ্ধাঞ্জলি—জীবিতকালে

গান্ধী হলেন সেই মানুষটি, যিনি ত্রিশ কোটি নরনারীকে বিপ্লবের পথের পথিক করেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ধর্ম্মের এমন একটা প্রেরণা এনেছেন মানুষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাঁর তুলনা আমরা দু' হাজার বছরের মধ্যেও দেখতে পাইনি।

—রোমাঁ রোলাঁ

গান্ধী একজন বিজয়ী যোদ্ধা, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বলপ্রয়োগের নিন্দা করেন। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি সাধারণ মানুষের মহত্ব নিয়ে ইউরোপের পশুশক্তির সম্মুখীন হয়েছেন।

—অধ্যাপক আইনষ্টাইন

ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা দিয়ে আমি বলছি যে, যীশুখৃষ্টের সঙ্গে গান্ধী একাসনে বসবার যোগ্য ব্যক্তি। —রেভারেণ্ড হোমস্

শ্রদ্ধাঞ্জলি—স্বর্গ-প্রয়াণে

আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর তলদেশ বুঝি খুলে গেছে! এখন আর পীড়িতের ব্যথা দূর করবেন কে? তাদের চোখের জলই বা মুছে দিবেন কে? আমাদের সমস্ত বিপদে আমরা যে তাঁরই নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, আর তিনি তা দিতে কখনো ত্রুটী করেন নাই। কাঁদো ভারতবর্ষ, কাঁদো—যতক্ষণ না তোমার বুক ভেঙে যায়! আসুন, তাঁর চির-ঈপ্সিত স্বপ্ন—হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ও মনের ঐক্য-সাধনে আমরা সচেষ্ট হই।

—এচ্. এস্. সারওয়ার্দ্দি

তিনি এ যুগের একজন মহামানব ছিলেন এবং জনগণের অন্তঃকরণে সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যে চেষ্টা করছিলেন, সেজন্য প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় লোকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁন

যে নেতা ভারতীয়দের জন্য স্বাধীনতা এনেছেন, তারা আজ তাঁকেই হারিয়ে বসলো! তাঁর আত্মত্যাগ ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য নিয়ে আসুক, এই আমার প্রার্থনা।

—মিঃ ডি. ভ্যালেরা

ওরা কেমন করে বাঁচে ?

—কুমারী রূপা ব্যানার্জ্জি

এক বেড়ালকে তাড়া করলে এক কুকুর! প্রাণের ভয়ে বেড়াল ছুটলো বন্ বন্ করে, কিন্তু কুকুরও তার পেছু ছাড়লো না। বেগতিক দেখে বেড়াল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, আর নিজের দেহটাকে ফেললো ধনুকের মত বাঁকিয়ে। তারপর সে তার লোম ফুলিয়ে, লেজ ঘুরিয়ে আর গোঁফ পাকিয়ে ফোঁস্-ফোঁস্ করে গর্জ্জাতে

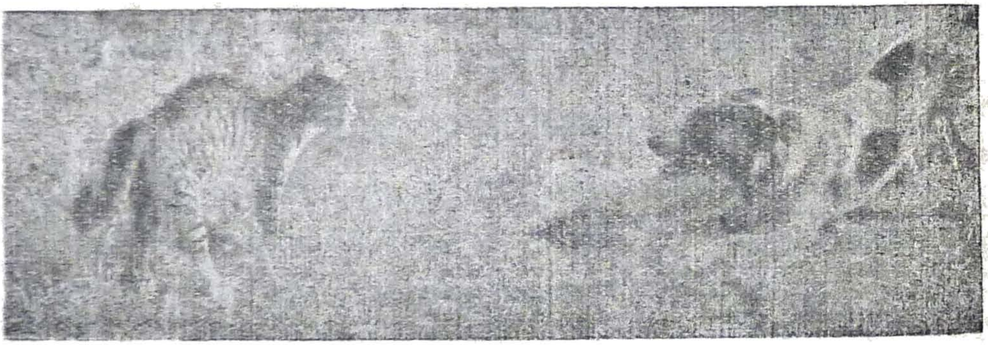

সশস্ত্র বেড়াল! তার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব!

লাগলো। তার দুধের মত সাদা দাঁত আর চোখা-চোখা ধারালো নখগুলি বেরিয়ে পড়লো।

বেড়ালের এই রকম-সকম দেখে কুকুরটা বুঝলে বেড়াল তখন আর নিরস্ত্র নয়, সে তার হাতিয়ার খুলে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কাজেই কুকুর তখন বেড়ালকে ছেড়ে দিয়ে মানে-মানে চলে গেলো।

এখন ভাবতে হবে, বেড়ালের হাতিয়ার কোন্‌গুলো? ঐ যে বেড়াল তার দাঁত আর নখ বার করলো, ঐ দুইটি হলো তার হাতিয়ার। ঐ হাতিয়ার দেখিয়েই সে কুকুরের বিক্রমকে স্তব্ধ করে দিলে!

শত্রুকে আক্রমণ করতে অথবা তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হাতিয়ারের দরকার হয়। মানুষ বুদ্ধিমান্ জীব; সে তার বুদ্ধির জোরে অনেক হাতিয়ার তৈরি করে নেয়; কিন্তু জীবজন্তুর বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির মত ধারালো নয়, তাই তারা কোন হাতিয়ার তৈরি করতে পারে না। ফলে, একমাত্র ভগবানের দেওয়া হাতিয়ার দিয়ে তাদের কাজ চালাতে হয়।

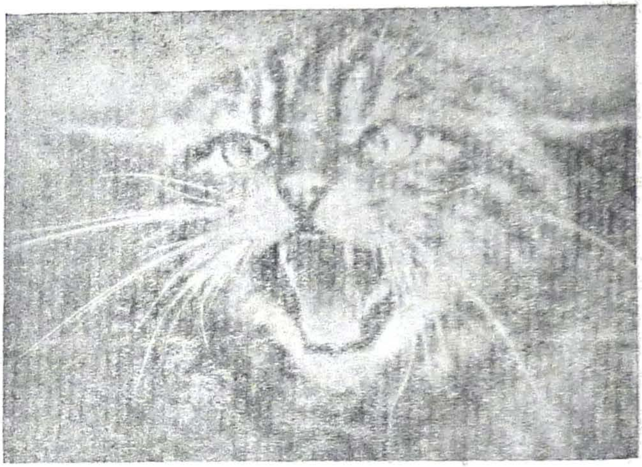

"দেখ্‌ছ আমার দাঁত!"

সব জানোয়ারের হাতিয়ার এক রকম নয়। কুকুর-বেড়াল থেকে আরম্ভ করে, বাঘ-সিংহ পর্য্যন্ত হিংস্র প্রাণীদের প্রধান হাতিয়ার দাঁত আর নখ; কিন্তু এই দাঁত আর নখ গোরু-মোষের বেলায় হাতিয়ার-হিসেবে একেবারেই অকেজো। তাদের নখ তো নেইই, আর দাঁতে এমন ধার যে, তা দিয়ে কেবল ঘাস কাটাই চলে। এই কারণে তাদের হাতিয়ার হয়েছে মাথার দুটো শিং। মোষের বাঁকানো শিংকে ভয় করে না কে?

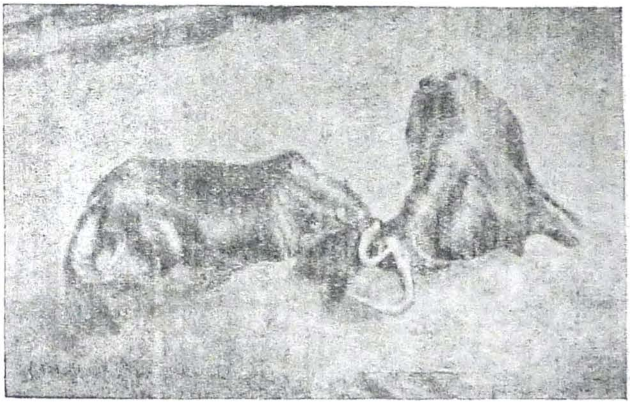

মোষের বাঁকানো শিংকে ভয় করে না কে ?

হাতীর প্রধান হাতিয়ার তার শুঁড়। এই শুঁড় দিয়ে সে তার শত্রুকে জড়িয়ে ধরে আছাড় মারে কিংবা পায়ের নীচে ফেলে চেপে মারে; কিন্তু শত্রু যদি

নাগালের বাইরে থাকে, তবে হাতীর পক্ষে তাকে বাগে পাওয়া একটু অসুবিধা হয়। তবু, ক্ষেত্র-বিশেষে, সে তার শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে বদমায়েস শত্রুকে কেমন ভাবে জব্দ করে, ছবিখানি দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়।

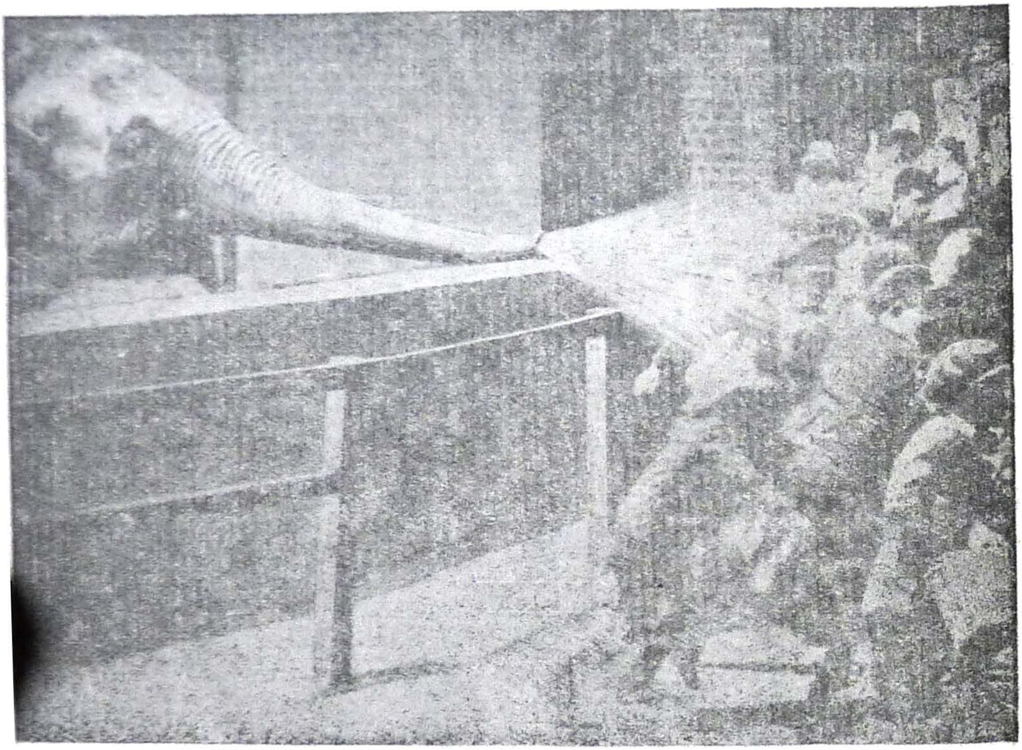

"কেমন জব্দ !"

এখন বড় বড় জন্তুর কথা বাদ দিয়ে একবার ছোট জন্তুর কথায় আসা যাক্। তাদেরও প্রধান হাতিয়ার দাঁত আর নখ। কিন্তু সাপের দাঁতের চেয়ে তার বিষই বড় হাতিয়ার। এ হাতিয়ারকে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, এমন কি মানুষও ভয় করে। কোন কোন সাপের আবার দেহটাই তার বড় হাতিয়ার। তার দেহটাকে দিয়ে সে অনেক সময় তার শিকারকে এমন বজ্র-বাঁধনে বেঁধে ফেলে যে, তার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। একেই বলে 'নাগ-পাশ'! বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতির হাতিয়ার তাদের বিষাক্ত হুল।

হাতিয়ার কেবল স্থলের জীবেরই থাকে না, জলের জীবদেরও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তাই তাদেরও নানা রকম হাতিয়ার থাকে।

জলের জীবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মাছের কথা। কোন কোন মাছের দাঁত আছে; সেই সব মাছের দাঁতই হাতিয়ার। হাঙ্গরের দাঁতকে সকলেই ভয় করে।

কতকগুলি সামুদ্রিক মাছের হাতিয়ার অদ্ভুত। "ইলেক্‌ট্রিক শক্‌" বা বিদ্যুতের আঘাত কাকে বলে, শহরের ছেলেমেয়েরা সেটা ভালভাবেই জানে। সাগরের রে-মাছ, বাইন মাছ প্রভৃতি এই রকম 'ইলেক্‌ট্রিক শক্‌' মেরে শত্রুকে দাবিয়ে

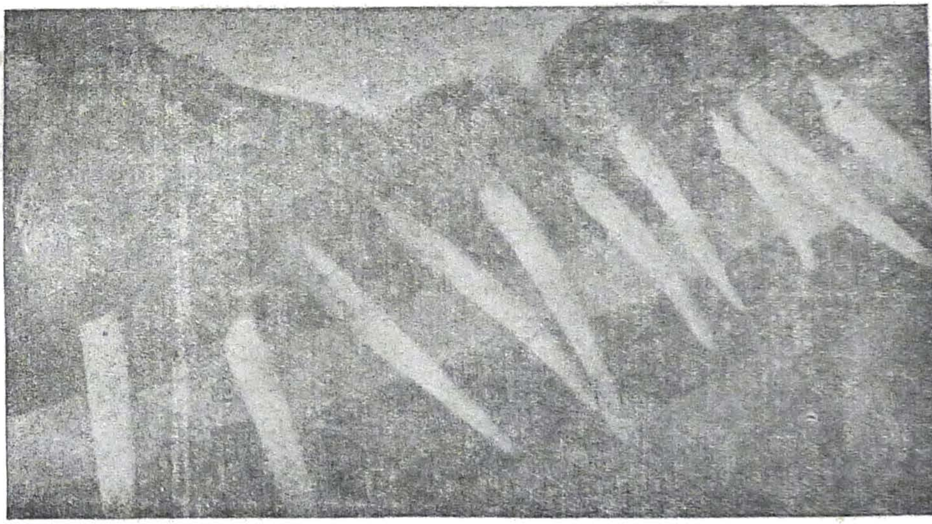

এই দাঁতের বহরে ভালুক পালায়।

দেয়। শঙ্কর মাছের লম্বা লেজে এমন বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে যে, তার আঘাতে শক্তিশালী জেলেকেও তারা কাবু করে ছাড়ে। এ ছাড়া সিন্ধু-ঘোটকের 'গজদন্ত'ও কম নয়। তার বহর দেখে শ্বেত ভল্লুক পর্য্যন্ত দূরে পালায়।

জীবজন্তুর যদি এম্‌নি ধারা অস্ত্র-শস্ত্র না থাক্‌ত তা হলে তাদের বাঁচাই হত কঠিন।

ধাঁধা

কলিকাতা

প্রিয় ,

তো পেয়েছি। এখানে স্বাধীনতা-

বে অনেক হয়েছে, হয়েছে খুব।

ও ১দম থেমে ।

নে☆ এখনো - শান্তির বাণী প্র৪

করছেন। তো কে আছ?

৮০র

চিঠিখানি পড় ত'।

নাথ।

আমাদের অভিনন্দন—

জয় হিন্দ্ !

শিশু-সাহিত্যের পবিত্র উদ্যানে পদার্পণ করবার আগে প্রণাম জানাই দেবতার পায়ে; তারপর বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকটি লোককে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে, আমাদের পুরোবর্ত্তী অপরাপর শিশু-সহযোগীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের পরিশ্রম ও আদর্শ বাঙালী ছেলেমেয়েদের কোমল বুকে অনেক দিন হতে সঞ্জীবন-রসের কাজ করে আসছে; বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের শত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও আমাদের অগ্রবর্ত্তী সহযোগীদের কাছেই খানিকটা আনন্দ ও শান্তি পেয়ে আসছিল। কাজেই সহযোগীদের কাছে আমরাও কৃতজ্ঞ—ছেলেমেয়েদের তো কথাই নাই!

আবার একখানা কাগজ কেন? প্রথম কৈফিয়ৎ—

এ কথার পরে অনেকে হয়তো জিজ্ঞেস্ করবেন, তা-হলে বাংলাদেশে আবার একখানা নতুন শিশু-মাসিকের উদয় কেন?—তাঁদের এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। প্রত্যুত্তরে আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই, মায়ের এক ছেলে যদি তার মাকে ভালবাসে, তা-হলে অপর ছেলের ভালবাসার কি কোন অধিকার নাই? অথবা, তা একেবারেই বৃথা? বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের অগ্রবর্ত্তী সহযোগীরা সে মায়েরই সেবা করে আসছেন; আমরাও আজ মায়ের সেবাব্রত মাথায় তুলে নিচ্ছি। কাজেই এই হিসেবে "শুকতারা"র উদয় নিছক মাতৃভক্তি।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ—

এ ছাড়া আরো একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।—বাঙালী পরিবারে দুঃখ-দৈন্যের অভাব নেই। তবু এরই মাঝে, কচি ছেলে-মেয়েরাই তাদের একমাত্র শান্তি ও আশা-ভরসা। তাদের বুকে আঁকড়ে নিয়েই গোটা বাংলাদেশ! কারণ, ছেলেমেয়েরাই দেশের আকর্ষণ, বাঙালী পরিবারে তারাই আমাদের বসোরাই গোলাপ! এম্‌নি সব গোলাপকে ভালবাসে না কে? গোলাপ ফুল তার নিজের ঐশ্বর্য্যের দাবীতেই

আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথবা উৎকট সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ মনোবৃত্তি কি মানুষের বিবেক এত উন্মাদ ও কলুষিত করে ফেলে ?—

পাশ্চাত্যে শিশুদের যত্ন—

শিশু-সাহিত্য-রচয়িতা ও শিশু-সাময়িকীর পরিচালকবর্গ শিশুদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব-সম্বন্ধে সচেতন থাকাই স্বাভাবিক। সেই দায়িত্ব-বোধের সময় কেহ যদি পাশ্চাত্য-দেশের শিশুদের সঙ্গে এদেশের শিশুদের তুলনা করতে সাহসী হন, তা-হলে হতাশায় বুক ভেঙে যায়! সোভিয়েট রাশিয়ায়, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ছেলেমেয়েদের জন্য কত বন্দোবস্ত রয়েছে! তাদের মা-বাপ্ চলে যান নিজেদের কাজে, ছোটদের রেখে যান নির্দিষ্ট শিশু-আশ্রমে। সেখানে তারা খেলাধূলা করে, গল্প শোনে, খায়-দায়—কত আনন্দ! তাদের দেখবার জন্য সরকারের নিয়োজিত স্নেহময়ী মহিলারা আছেন, মায়ের মতো তাঁরাই ওদের দেখাশোনা করেন। আর, আমাদের এ দেশে ?—

শিশুদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য বন্দোবস্ত আছে কত! যে কেউ তাঁর ছেলেমেয়েদের সেইখানে নিয়ে, ডাক্তার দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাতে পারেন। কোন টাকার দাবী নেই, ভ্রূকুটি বা বিরক্তি নেই, "এই চোপ্ রও, পেট দেখ্‌লাও" বলে হুম্‌কি বা শাসন নেই। এমন ব্যবস্থা কি আমাদের দেশে হতে পারে না ? অন্ততঃ পশ্চিম-বঙ্গে ? আমাদের গভর্ণর বাহাদুরের খানিকটা পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি; প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ও আমাদের সুপরিচিত। কাজেই আমরা যদি তাঁদের কাছে শিশু-স্বাস্থ্যের নিঃস্বার্থ যত্ন দাবী করি, আশা করি তা কখনো অন্যায় হবে না।

টিটাগড়ে শিশু-প্রদর্শনী—

কিছুকাল আগে টিটাগড়ে শ্রীযুক্তা পদ্মিনী সেনগুপ্তার উদ্যোগে এক শিশু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোন্ শিশুর স্বাস্থ্য কেমন, তা বিচার করে সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্যবান্ শিশুদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার এই উদ্যমকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করছি। বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েকেই প্রধানতঃ দারিদ্র্যের জন্য অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে, অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে, বিষণ্ণমুখে কোন রকমে বেঁচে থাকতে হয়। তাদের আনন্দ ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করতে হলে সর্ব্বাগ্রে এমনি ভাবে মায়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। বারান্তরে এই শিশু প্রদর্শনী ও পাশ্চাত্য-দেশে শিশু যত্ন সম্বন্ধে কয়েকখানি ছবি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের রইলো।

পরলোকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি—

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার, ৫২।এ, হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর নিজ বাড়ীতে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকে চলে গেছেন। বাংলা-সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জে

সকলের ভালবাসা আদায় করে নেয়—আমরাও তাই বাংলার গোলাপ-কুঞ্জে বাঁধা পড়ে গেছি। কাজেই তাদের মুখের হাসি যাতে শুকিয়ে না যায়, সে হাসি যাতে আরো শতগুণে বাড়িয়ে তোলা যায়, তাদের জীবন যেন রূপ-রস ও গন্ধে আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আমাদের স্নেহান্ধ মমতা-সিক্ত হৃদয় আজ উদ্বেল কণ্ঠে সে কামনাই করছে! আমাদের গোপন-বুকের অন্তর্নিহিত সেই কামনাটুকুই মাত্র সম্বল করে, আমরাও আজ সেই ফুলের কুঞ্জে প্রবেশ করছি। উদ্দেশ্য,—তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে যদি তাদের পায়ের কাঁটা ও আগাছা কিছু তুলে ফেলা যায়! এমন একখানি নতুন মাসিক বার করবার জন্য বাংলার গোলাপ-শিশুরাও আমাদের কাছে অবিরত যে দাবী জানিয়ে আসছিল, তার দামও নিতান্ত কম নয়,—আমরা তা উপেক্ষা করতে পারলুম না।

পশ্চিম-বাংলার শিশু-দরদী গভর্ণর—

কিন্তু সৎ শিশু-সাহিত্যে বাধা অনেক, একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। তবু সুখের বিষয়, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান সময়ে বাংলা-দেশে যিনি গভর্ণরের পদে সমাসীন, শিশু-সাহিত্যে তাঁরও উৎসাহ বুঝি কারো চেয়ে কম নয়! 'শুকতারার' অভ্যুদয়কে উৎসাহ দিয়ে তিনি আমাদের কাছে যে লিপি পাঠিয়েছেন, তাতেই তাঁর দরদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! তিনি আমাদের আশা দিয়েছেন, তাঁর সুবিধামত একদিন তিনি আমাদের 'শুকতারা'-কার্য্যালয়ে পদার্পণ করবেন। আমরা অধীর আগ্রহে সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করছি।

আকস্মিক দুঃসংবাদ—

'শুকতারার' জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এই সর্ব্বপ্রথম। সুতরাং সে প্রবন্ধ আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার আলোয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখিত হবে এবং ভাবে ও ভাষায় হবে সমৃদ্ধ, সম্পাদকের কাছে এ আশা করাই পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু হঠাৎ আনন্দ-বাসরে এক গভীর বিষাদের ছায়া এসে পড়েছে! বিগত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বিকেল বেলায় মহাত্মা গান্ধী যখন দিল্লীর এক প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলেন, ঠিক্ তেম্‌নি সময় নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামক এক মারাঠী লোক উপর্য্যুপরি তিনবার গুলি করে মহাত্মাকে হত্যা করেছে। এই শোচনীয় হত্যা-কাণ্ডে সারাদেশ এখন শোকে মুহ্যমান্ ও বিভ্রান্ত। কাজেই "শুকতারার" পাঠক-পাঠিকারাও সম্ভবতঃ হতাশ বোধ করবেন!

মহাত্মার হত্যাকারী এখনো অনুতপ্ত নয়!—

প্রকাশ যে, হত্যাকারী বিনায়ক গড্‌সে সুশিক্ষিত ও এক দৈনিক কাগজের সম্পাদক! আর একথাও প্রকাশ যে, হত্যাকাণ্ডের পরেও সে নাকি বলেছে যে, সে তার কাজের জন্য একটুও দুঃখিত নয়। মহাত্মার ন্যায় জগদ্বরেণ্য ব্যক্তিকেও নৃশংস ভাবে হত্যা করেও যে পরিণত-বয়স্ক ও শিক্ষিত ব্যক্তি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত বোধ করে না, তার মস্তিষ্কের সুস্থতার সম্পর্কে

তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। দেব সাহিত্য-কুটীরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের প্রকাশিত এ বছরের পূজা-বার্ষিকী "রাঙারাখী"তে এবারও তাঁর লেখা বেরিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন যথার্থ দরদী বন্ধুর অভাব বোধ করছি। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দিন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ভারত ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা-লাভ—

গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ শক্তি অতি নাটকীয়ভাবেই ভারতীয়দের হাতে ভারত-শাসনের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই দেশ এখন স্বাধীন। বর্তমান সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মের স্বাধীনতা-লাভ উৎসবও সম্পন্ন হয়ে গেছে। সে উৎসবে স্বাধীন-ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রেঙ্গুণে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অপর দেশের স্বাধীনতা-উৎসবে একজন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করে স্বাধীন ব্রহ্মের অধিবাসিগণ সমগ্র ভারতবর্ষকেই সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম্!

ইহার অর্থ কি?